দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রা
— পৃঃ ২৩

বঙ্গ রাজনীতিতে শুভ সংকেত
— পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ২৫ মার্চ, ২০২৪।। ১১ চৈত্র, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ১১ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২৫ মার্চ - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

সংশোধিত নাগরিক আইনের অপব্যাখ্যায় মিথ্যা আর মমতা সমার্থক ‘শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না’

◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

আমি হিন্দু, ভোটের লাইনে মন্ত্র হোক

◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

কুরুক্ষেত্র হৃদয়ে ধারণ করে যোগী আদিত্যনাথের হুংকার ‘কাশী-মথুরা বাকি হ্যায়’ ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ৮

বিশ্বগুরু হওয়ার পথে ভারত ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

বঙ্গ রাজনীতিতে শুভ সংকেত ◻ **শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী** ◻ ১১

গল্প : আশা ◻ **ড. রাকেশ দাশ** ◻ ১৩

গল্প : ফাগুয়ার আগুন ◻ **নিখিল চিত্রকর** ◻ ১৯

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রা ◻ **গোপাল চক্রবর্তী** ◻ ২৩

গল্প : তমসা মা জ্যোতির্গময় ◻ কালাচাঁদ রায় ◻ ৩১

রঙে রঙে রঙের উৎসব ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩৭

গল্প : বশবর্তী ◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ৪৩

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের যোগদান নিশ্চিতভাবেই রাজনীতিতে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবে ◻ তারক সাহা ◻ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ চিঠিপত্র : ৪৬ ◻ সুস্বাস্থ্য : ৪৭ ◻ রঙ্গম : ৪৮ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

প্রকাশিত হবে ১ এপ্রিল, ২০২৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১ এপ্রিল, ২০২৪

সি. এ. এ. (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-২০১৯)

বিরোধিতা কেন?

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৯ সালে সংসদে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে বলেছেন, এই আইন শুধুমাত্র শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য। তা সত্ত্বেও কিছু নেতা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধ করতে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন, বিভ্রান্ত করে চলেছেন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য তুলে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রঙের উৎসব

ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে দোল পূর্ণিমা বলা হয়। ইহা রঙের উৎসব। সমগ্র ভারতবর্ষ এই উৎসবে মাতিয়া ওঠে। প্রকৃতিও এই সময় নানা রঙে নিজেকে সাজাইয়া তোলে। অশোকে-পলাশে-শিমুলে প্রকৃতি স্বয়ং রাঙিয়া ওঠে। এই সময় ভারতবর্ষের মানুষও মেতে ওঠে রঙের উৎসবে। কম করিয়াও পাঁচহাজার বৎসরের প্রাচীন এই উৎসব। মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে রাধা-কৃষ্ণের দোল উৎসবের উল্লেখ রহিয়াছে। বঙ্গপ্রদেশে দোলযাত্রা, দোলপূর্ণিমা, গৌরপূর্ণিমা, দোল উৎসব বলা হইলেও অন্যান্য রাজ্যে ইহাকে হোলি উৎসব বলা হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী কেশী নামক দৈত্যকে বধ করিয়া তাহার রক্তে আনন্দ উৎসব করিয়াছিলেন। অত্যাচার নির্মূলের সেই উৎসব হোলি নামে অভিহিত হইয়াছে। হোলি উৎসব হোলিকা দহনের সহিতও জুড়িয়া রহিয়াছে। বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে আগুনে দগ্ধ করিয়া মারিতে যাইয়া হোলিকা নিজেই দগ্ধ হইয়া মরিয়াছিল। হোলিকা দহনের স্মরণে সমগ্র ভারতবর্ষে পূর্বদিবস বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন করা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ইহাকে নেড়াপোড়া, বুড়ির ঘরপোড়া, চাঁচর ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। আনন্দের এই উৎসবে দেশের আকাশ-বাতাস, পথঘাট আবিরে-কুমকুমে, নানান রঙে রঙিন হইয়া ওঠে। সমগ্র দেশে এক আনন্দের হিল্লোল বহিয়া চলে। ধনীর অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের কুটির পর্যন্ত রঙে রঙে রঙিন হইয়া ওঠে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচিয়া যায়। মানুষ একাত্ম হইয়া ওঠে।

রাধা-কৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত মথুরা-বৃন্দাবনের দোল উৎসব যেন জীবন্ত হইয়া ওঠে। মথুরা-বৃন্দাবনের নর-নারীরা এইদিন কৃষ্ণ ও রাধাভাবে মাতোয়ারা হইয়া পড়েন। উৎসব উদ্‌যাপন ও দর্শনের জন্য এইদিন মথুরা-বৃন্দবনে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। বাঁকেবিহারী মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহকে ঘিরিয়া আবির খেলা চলিলেও শ্রীরাধা নামে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া ওঠে। দোল উৎসবের দিনে প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণে বঙ্গজীবনে এই উৎসব এক অন্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ষোড়শ শতকে হিন্দু সমাজের ত্রাতা হিসাবে তাঁহার আবির্ভাব। হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে তিনি হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করিয়া হিন্দু সমাজে নববলের সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব প্রকারের ভেদাভেদ দূর করিয়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একাসনে বসিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধুমাত্র কৃষ্ণনামের মাধ্যমে প্রেম-ভালোবাসা বিতরণ করিয়া ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার জন্যই বাঙ্গালি হিন্দু নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে বঙ্গদেশে দোল উৎসব উদ্‌যাপন করিবার মতো কেহ থাকিতেন না। বাঙ্গালি তাঁহাকে রাধা-কৃষ্ণের মিলিত রূপ বলিয়া মনে করে। বঙ্গের দোল উৎসব তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। মথুরা-বৃন্দাবনের হোলির ন্যায়ই নবদ্বীপের দোল উৎসবও স্বমহিমায় প্রাণবন্ত। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া নবদ্বীপে দশদিন ধরিয়া উৎসব চলিয়া থাকে। উৎসব দর্শন এবং অংশগ্রহণের নিমিত্তে নবদ্বীপ ও মায়াপুরে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। এই সম্পাদকীয় রচনা অবধি নবদ্বীপ ধামে একশতটি দেশ হইতে সহস্রাধিক ভক্ত সমাগম হইয়াছে। অবিরত কৃষ্ণনাম কীর্তনে তাঁহারা তুমুল ভাবাবেগে নৃত্য করিতে করিতে নবদ্বীপের পথে পথে পদব্রজে পরিক্রমা করিতেছেন।

দোল উৎসবের সময় বসন্তকাল। এই সময় প্রকৃতিতে শুরু হয় নূতন প্রাণের উদ্‌গম। প্রকৃতি স্বয়ং রঙে রঙে সাজিয়া ওঠে। তাই এই দেশের সাহিত্য, কবিতা, গান ও চিত্রকলায় রহিয়াছে বসন্ত বা প্রকৃতি বন্দনা। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত বসন্তোৎসব আসলে প্রকৃতি বন্দনাই। প্রকৃতি ও পুরুষ হইলেন রাধাকৃষ্ণ। দোল উৎসবের কেন্দ্রে রহিয়াছেন রাধাকৃষ্ণ । বঙ্গে এই উৎসবের কেন্দ্রে রহিয়াছেন শ্রী গৌরাঙ্গ।

সুভাষিতম্

আত্মা যস্য বশে নাস্তি কুতস্তস্য পরে জনা।
আত্মানং বশমানীয় ত্রৈলোক্যংবর্ততে বশঃ।।

যিনি নিজেকে বশীভূত করতে পারেন না, তিনি অন্যকে কীভাবে বশীভূত করবেন। নিজেকে বশীভূত করতে পারলে ত্রিলোক বশীভূত হয়ে যায়।

সংশোধিত নাগরিক আইনের অপব্যাখ্যায় মিথ্যা আর মমতা সমার্থক

‘শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না...’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সময়টা ভালো যাচ্ছে না মুখ্যমন্ত্রীর। দু’বছরে চারবার চোট পেলেন। শেষ চোট ঘরে। কারণ গৃহদাহ। শুনেছি দু’ ভাইয়ের বিবাদ মেটাতে গিয়েই বিপত্তি। মুখ খুলতে নারাজ মমতা। ঘরের ঝগড়া লুকোতে চান। সে বিবাদ এখন ‘ওপেন সিক্রেট’। খোলা ময়দানে। গৃহদাহ চাপতে ‘কনকাশন অব ব্রেন’ মানে মস্তিষ্কে ধাক্কা আর ‘পুশ ফ্রম বিহাইন্ড’ মানে ‘পিছন থেকে ধাক্কা’-র তত্ত্ব খাড়া হয়েছে। কনকাশনে মানুষের স্মৃতিভ্রংশ হতে পারে। সিটিস্ক্যান বা এমআরআই করে ধরা পড়ে না। তাই ‘কনকাশন’ বিষয়টি ভাসিয়ে রাখা হয়েছে যাতে ১৪ মার্চ বিকেলে ৫.৩০ থেকে ৭.২০-র মধ্যে বাড়িতে কী ঘটেছিল মমতা ইচ্ছামতো ভুলে যেতে পারেন।

ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবুন) হাওড়ার তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে উলটো সুরে বাজছিলেন। তাকে হারাতে নির্দল প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। যে কোনো অস্বস্তির বিষয় থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে মমতা সিদ্ধহস্ত। মমতা কোনো ব্যতিক্রমী রাজনীতিক নন। সংশোধিত নাগরিক আইন (সিএএ)-‘ক্যা কে ব্যা’ করে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। তাঁর ধারণাটি সংবিধান বিরোধী, কারণ সংবিধানের ২৪৬ ধারায় বলা হয়েছে সংসদ কোন বিষয় আইন করবে আর বিধানসভা কোন বিষয়। কেন্দ্রীয় তালিকার ৯৭টি বিষয় আইন প্রণয়নের অধিকারের মধ্যে নাগরিক আইন রয়েছে। মমতা এসব জানেন। তাহলে কেন বিরোধিতা?

২০০৪ সালে মমতা অনুপ্রবেশ বিরোধী ছিলেন। ভোট জিততে এখন অনুপ্রবেশ দরদি। রাস্তার রাজনীতি করেন তাই রক্তাক্ত নাক আর কপাল নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা উপেক্ষা করে হাসপাতাল চলে যান। ছবি তুলিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। তাঁর সার্বিক সহায়তায় একটি পুরো মেডিক্যাল ইউনিট রয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতার ভাষা-সন্ত্রাস সহজাত হয়ে উঠেছে। দেশের আইনকে সম্মান দিয়ে বিরোধিতা করার রুচিটুকু হারিয়ে ফেলেছেন। মনে করেন ভোটে জিততে হলে সস্তা আর মিথ্যার রাজনীতি করতে হবে। ২০২১-এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত ছ’বার সংশোধিত নাগরিক আইনের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তা নিয়ে চর্বিতচর্বণ করছি না। সংশোধিত আইনটিকে একটি মিথ্যা সন্দেশের মোড়কে মানুষের কাছে পরিবেশন করছেন মমতা।

বহুদিন ধরে রাজ্যে শরণার্থী আর বেঘর হয়ে থাকা আনুমানিক ৫০ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবারের কাছে সংশোধিত আইনের প্রয়োজনটা কেবল ভোটের নয়। মমতা ইচ্ছা করেই বুঝতে চান না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাতজোড় করে বিরোধীদের আইন মেনে নিতে মিনতি করেছেন। লক্ষাধিক অসহায় হিন্দু উদ্বাস্তুর অস্তিত্ব সংকট মেটানো আর নির্ধারণের সোপান এই আইন। তার সঙ্গে আটকাবে অবৈধ অনুপ্রবেশ। এই সত্যটা মমতা মানছেন না। ইচ্ছাকৃত এই পদক্ষেপের জন্য ইতিহাস তাকে ক্ষমা করবে না। মিথ্যাকেই সঙ্গী করেছেন মমতা।

> **দশ বছরে ৯০ শতাংশ ভোট হেরে গিয়েও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মনে করেন তিনি ঠিক পথে রয়েছেন। পরিণত রাজনীতিবিদ হয়েও মমতা মনে করেন সব মানুষকে সব দিন বোকা বানিয়ে রাখা যায়। এটাই তাঁদের বোকামি।**

তাছাড়া লোকসভা ভোটের মুখে মমতার দুধেল গাই (মুসলমান সম্প্রদায়)-এর ওপর এই আইন যে কোনো প্রভাব ফেলবে না ওই সম্প্রদায়ের বহু মানুষ ইতিমধ্যেই তা মেনে নিয়েছেন। মমতা রাজনৈতিক ফয়দা লোটার জন্য সিএএ-র সঙ্গে নাগরিক পঞ্জীকরণ, ডিটেনশন ক্যাম্প জুড়ে একটি অস্তিত্বহীন ‘জুজু’ তৈরি করতে চাইছেন। উদ্দেশ্য একটাই, হিন্দুদের ভয় দেখানো আর মুসলমানদের অহেতুক অভয় দেওয়া। তাদের ভোটের ‘বোড়ে’ বানাতে। তাতে সাপ মরবে আর লাঠি ভাঙবে না।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে সিএএ-সংক্রান্ত অপপ্রচার দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি প্রয়াস। সংশোধিত আইন ঘিরে বিভ্রান্তি তৈরির মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার মমতার চেষ্টার গুড়ে বালি পড়তে চলেছে। তার একসময়ের উপদেষ্টা তেমনটাই জানিয়েছেন। হয়তো বুঝেছেন মমতার ‘শাক দিয়ে মাছ’ ঢাকার খেলা শেষ। ঘরে আর বাইরে অর্থাৎ রাজ্যে। দশ বছরে ৯০ শতাংশ ভোট হেরে গিয়েও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মনে করেন তিনি ঠিক পথে রয়েছেন। পরিণত রাজনীতিবিদ হয়েও মমতা মনে করেন সব মানুষকে সব দিন বোকা বানিয়ে রাখা যায়। এটাই তাঁর ও রাহুলের বোকামি। লোকসভা ভোটে এই বোকামির খেসারত তাদের দিতে হবে। □

আমি হিন্দু, ভোটের লাইনে মন্ত্র হোক

সদা বিস্মরণেষু,

প্রতি সপ্তাহে আমি দিদিকে চিঠি লিখি। কিন্তু এবার একটা কথা না বললেই নয়। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সহজে সব ভুলে যাওয়া হিন্দু ভোটারদের ডাক দিতেই হবে। ভোটের লাইনেও মনে মনে উচ্চারণ করতে হবে একটি মন্ত্র— 'আমি হিন্দু'। পাঁচ বছর আগের একটা ভুলে যাওয়া কথা মনে করাই। বিজেপি ১৮টি আসনে জিতেছে। দিদির দল অনেক আসন খুঁইয়েছে। উত্তরবঙ্গে অস্তিত্বই নেই। ফল ঘোষণার দিনই দিদি বলেছিলেন, 'আমি তো তোষণ করি। হাজার বার করব! যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথিও ভালো!'

মুসলমান সম্প্রদায়কে 'গোরু বলায় আমার সমর্থন নেই। কিন্তু একই ভাবে হিন্দু সমাজকে 'গোরু' না ভাবাতে আমার মনে হয়েছিল গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। হিন্দু সমাজ সেটা বোঝেনি। দিদির তোষণ দেখেছে। এর পরেও বিধানসভা নির্বাচনে দিদিকেই জিতিয়েছে। বিজেপির শক্তি বেড়েছে বলে যাঁরা শ্লাঘায় ভোগেন আমি তাঁদের দলে নই। বরং, আমি এটা নিয়ে চিন্তিত যে, মুসলমান তোষণ করে দিদি ওই সম্প্রদায়ের ভোট পান আর হিন্দুদের তোষণ না করেই ভোট পেয়ে যান। মাত্র ৫০০ টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাবদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট জিতে নেন। এ বারেও দিদি বলেছেন ভোটের পরে ৫০০ বেড়ে এক হাজার হবে। এই প্রতিশ্রুতিও দিদি রাখবেন। কিন্তু হিন্দু মা-বোনেরা কি আবার দিদিকেই ভোট দেবেন? এ নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন রয়েছে। এবং আমি মনে করি, হিন্দু মা-বোনদের বড়ো অংশের ভোট এই লোকসভা নির্বাচনেও দিদির প্রতীকে পড়বে।

সন্দেশখালির মায়েদের কষ্ট মনে রাখবে না আরামবাগের বোনেরা। কামদুনির কান্না ভুলেই গিয়েছে কলকাতার মানুষ। সন্দেশখালিতে যে ভাবে হিন্দু মায়েদের উপরে রাতের পর রাত অত্যাচার হয়েছে তার জবাব দেওয়ার দায়িত্ব কি বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, হাওড়ার মা-বোনেদের নেই? তবু বলছি, এক হাজার টাকা মাসে মাসে পাওয়ার লোভ সামলাতে পারবেন না অধিকাংশ মা-বোনেরা।

কারণ, আমি নিজে কানে শুনেছি 'দিদির টাকা পাই'। অনেককে এমনটাও বলতে শুনেছি, 'যেই আমার ৬০ বছর বয়স হয়েছে অমনি অ্যাকাউন্টের টাকা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে দিদি এক হাজার করে দিয়েছেন।' হায় কপাল! হিন্দু মায়েদের কে বোঝাবে এই কথা! যে টাকা পাচ্ছেন সেটা দিদির নয়। রাজ্য সরকারের টাকা। যে রাজ্য সরকার ধার করে করে আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে দিচ্ছে। যে টাকা পাচ্ছেন তার একটা বড়ো অংশ আসছে আপনাদের স্বামী, সন্তানকে মদ বিক্রি করে। আপনি কেন ভুলে যাচ্ছেন, আজ আপনার ছেলে রাজ্যে কাজের সুযোগ পেলে সেই-ই আপনাকে মাসে মাসে হাত খরচের টাকা দিতে পারত। সেটা হয়তো আরও বেশি। কিন্তু দিদির সরকার যুবকদের চাকরি না দিয়ে, কাজের সুযোগ না তৈরি করে তার বদলে মাসে মাসে ভিক্ষা দেওয়ার মনোভাব নিয়ে টাকা দিয়ে যাচ্ছে।

> **দুর্গা, কালীর বঙ্গের মহিলারা যদি আজ ঘুরে না দাঁড়ায় তবে এ রাজ্যকে বাঁচানো যাবে না। বঙ্গমাকে বাঁচানো যাবে না। আজ যে আগুন বসিরহাটে, তা ছড়িয়ে পড়ার সময়ে এসে গিয়েছে। এখন থেকে সাবধান না হলে বিপদ হবেই।**

আজ স্বামী বিবেকানন্দের সেই ডাক নতুন করে মনে করতে হবে— 'হে ভারত, ভুলিও না— তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।'

আজ সবার মনে রাখার সময়ে এসেছে, সন্দেশখালির মা আমার মা। সন্দেশখালির বোন আমার বোন। শাজাহান শেখ এবং তাঁর মাথায় হাত রাখা লোকেরা হিন্দু হলেও আমার শত্রু। তাঁকে বিনাশ করতেই হবে। মনে রাখবেন দুর্গা, কালীর বঙ্গের মহিলারা যদি আজ ঘুরে না দাঁড়ায় তবে এ রাজ্যকে বাঁচানো যাবে না। বঙ্গমাকে বাঁচানো যাবে না। আজ যে আগুন বসিরহাটে, তা ছড়িয়ে পড়ার সময়ে এসে গিয়েছে। এখন থেকে সাবধান না হলে বিপদ হবেই।

গোটা দেশ আমাদের পাশে রয়েছে। কিন্তু আমরা কি আমাদের পাশে রয়েছি? তার প্রমাণ দিতে এই ভোটেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যারা গর্ব করে বলতে পারে 'আমি তোষণ করি' তারা যদি আবার জিতে যায় তবে তোষণ কোথায় যাবে একবার কল্পনা করুন। যদি ভাবতে পারে হিন্দু ভোট না পেলেও আমার চলবে। হিন্দু মহিলাদের ভোট আমি কিনে নেব ঠিক। তবে এ রাজ্যের হিন্দুদের নতুন ঠিকানার খোঁজ নিতে হবে এখন থেকেই। পালানোর পথ পরে আর পাওয়া যাবে না। □

কুরুক্ষেত্র হৃদয়ে ধারণ করে যোগী আদিত্যনাথের হুংকার 'কাশী-মথুরা বাকি হ্যায়'

সাধন কুমার পাল

১৯৯২ সালে অযোধ্যার বাবরি কাঠামো ধ্বংস হওয়ার পর 'ইয়ে তো সির্ফ ঝাঁকি হ্যায়, কাশী-মথুরা বাকি হ্যায়!' স্লোগানটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে স্লোগানটি আপাতদৃষ্টিতে উগ্র মনে হলেও স্লোগান দাতাদের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা প্রশ্নাতীত। কারণ বিতর্কিত স্থানে কেউ বলপূর্বক মন্দির নির্মাণ করতে চেয়েছে বা সেই উদ্দেশ্যে আন্দোলন সংগঠিত করেছে এমন দৃষ্টান্ত নেই। সমস্ত হিন্দু সমাজ আদালতের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং আদালতের রায় আসার পর সম্পূর্ণ সাংবিধানিক পদ্ধতিতেই রামমন্দির নির্মাণ হয়েছে।

শ্রীরামমন্দির উদ্বোধন হওয়ার পর একমাসও হয়নি। অযোধ্যা, বারাণসী ও মথুরার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'আমরা মাত্র তিনটি জায়গা চেয়েছি। অন্য জায়গা নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি।'... 'ওই তিনটি স্থল চাওয়া হচ্ছে এবং তার কারণ এগুলো কোনও সাধারণ জায়গা নয়। এগুলি বিশেষ স্থান। ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়েছেন ওই স্থানগুলিতে।'

যোগী আদিত্যনাথের অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ওই তিনটি জায়গার সঙ্গে 'অবিচার' করা হয়েছে। মহাভারতের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'অন্যায়ের কথা বলতে গেলে আমাদের পাঁচ হাজার বছর আগের কথা বলতে হয়। সেই সময় পাণ্ডবদের প্রতিও অবিচার করা হয়েছিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মাত্র পাঁচটি গ্রাম আমায় দাও, বাকিটা তোমাদের কাছে থাক।' যোগী সরকারের বক্তব্য, এখন পাঁচের পরিবর্তে দাবি মাত্র তিনটি স্থানকে ঘিরে।

কিছুদিন আগে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া

(এএসআই) তার রিপোর্টে জানিয়েছে, জ্ঞানবাপী মসজিদের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ এবং স্থাপত্যের অবশেষ, বৈশিষ্ট্য নিদর্শন শিলালিপি, শিল্প ও ভাস্কর্যের অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে বলা যায় বর্তমান কাঠামো নির্মাণের আগে সেখানে একটা হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। অন্যদিকে, মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির সংলগ্ন ইদগাহ মসজিদ ঘিরে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। হিন্দু মন্দিরের জমিতে ওই মসজিদ তৈরি হয়েছে এই দাবি জানিয়ে ইদগাহ অপসারণের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে হিন্দুপক্ষ।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এএসআই)-র জ্ঞানবাপী মসজিদ সমীক্ষার রিপোর্ট জনসমক্ষে আনার নির্দেশ দেয় বারণসীর জেলা আদালত গত ২৪ জানুয়ারি। পরদিন সেই রিপোর্ট জনসমক্ষে আসে। এরপর ৩১ জানুয়ারি ওই আদালতের বিচারক ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে হিন্দুদের পূজা করার অনুমতি দেন। সেই রাতেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে পূজা শুরু হয়ে যায়। মথুরাতে ইদগাহ ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমিকে ঘিরে হিন্দু ও মুসলমান পক্ষের সংঘাত দীর্ঘদিনের। মামলাও চলছে বহুদিন। ২০২২ সালে এই স্থানটিকে শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যে আরেকটি জনস্বার্থ মামলা খারিজ হয়ে যায়। তবে সম্প্রতি অজয় প্রতাপ সিংহের দায়ের করা আরটিআইয়ের উত্তরে আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য জানিয়েছে। 'এএসআই আরটিআইয়ের উত্তরে জানিয়েছে, মথুরার শাহি মসজিদ ইদগাহ তৈরি হয়েছিল কেশবদেবের মন্দিরের উপর। অর্থাৎ সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে, বারাণসী ও মথুরা দুই জায়গাতেই আগে মন্দির ছিল, সেটা ধ্বংস করে মসজিদ হয়েছে।'

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ প্রমাণ করে দিয়েছে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর বিদেশি আক্রমণকারীদের রেখে যাওয়া কলঙ্কচিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্য হিন্দু সমাজ সংবিধান সম্মত উপায়ে বছরের পর বছর ধৈর্য সহকারে জনআন্দোলন সংগঠিত করে আদালতের রায়ের অপেক্ষা করেছে এমন দৃষ্টান্ত আর নেই। গ্রিক সিটি টাইম-এর সম্পাদক পল আন্তোনোপোলোস তাঁর এক্সহ্যান্ডেলে ভারতের বেশ কয়েকজন সমালোচক একহাত নিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে রামমিন্দরের পুনরুত্থান ছিল 'প্রায় অকল্পনীয়'। আন্তোনোপোলোস এক্সহ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন— '৫০০ বছর আগে হিন্দুরা কখনই কল্পনা করতে পারেনি যে মুঘল শাসক বাবর অযোধ্যায় রামমন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করার পরে মন্দির পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব। পল আন্তোনোপোলোস আরও লিখেছেন, '২২ জানুয়ারি, ২০২৪, এই কর্মীদের প্রায় অকল্পনীয় কিছু সম্ভব করার জন্য আশীর্বাদ করা হচ্ছে এবং ধন্যবাদ দেওয়া হচ্ছে। জয় শ্রীরাম! রামমন্দির জেগে উঠছে!'

২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ এক্সহ্যান্ডেলে-পোস্টের একটি পৃথক শৃঙ্খলে, এথেন্স-ভিত্তিক এই সাংবাদিক ১৮৩০ সালে অটোমান সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভের পর গ্রিস দ্বারা 'প্রত্যাবর্তন' করা কয়েকটি গির্জার তালিকা তৈরি করেছিলেন। ২৩ জানুয়ারি তিনি

লিখেছেন, 'মোনেমভাসিয়ার হাগিয়া সোফিয়া চার্চটি প্রায় ১১৫০ সালের দিকে নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু ১৭১৫ সালে একটি মসজিদে পরিণত হয়। এটিকে আবার একটি গির্জায় পরিণত করার জন্য মেরামতের কাজ ১৮২৭ সালে শুরু হয়।'

'রোডসের অ্যাজিওস স্পাইরিডন' গির্জাটি ১২০০-এর দশকে নির্মিত হয়েছিল, ১৫২২ সালে অটোমানরা দ্বীপটি দখল করার পরে এটি একটি মসজিদে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু অটোমানরা ক্ষমতায় ফেরার পর এটি একটি গির্জায় পরিণত হয়েছিল। মিনারটি এখনো টিকে আছে।'

'থেসালোনিকির পানাগিয়া চালকিয়নের' চার্চটি ১০২৮ সালে নির্মিত হয়েছিল, ১৪৩০ সালে অটোমানরা শহরটি দখল করার পরে একটি মসজিদে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু ১৯৩৪ সালে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।' রোডেসের পবিত্র ট্রিনিটি গির্জাটি ১৩৫৬ ও ১৩৭৪ সালের মধ্যে একটি ক্যাথলিক গির্জা হিসেবে নির্মিত হয়েছিল, অটোমানদের দ্বারা খানজাদে মেসিডি নামক একটি মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল, তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গ্রীস দ্বারা দ্বীপটি পুনরুদ্ধার হলে এটি অর্থোডক্স চার্চে পরিণত হয়।

'২৫ জানুয়ারি ২০২৪ তিনি এক্সহ্যান্ডেল-পোস্টে লিখেছেন, চার্চ অব হোসিওস ডেভিড পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে থেসালোনিকিতে নির্মিত হয়েছিল, ১৫ শতকে অটোমানরা যখন শহর আক্রমণ করেছিল তখন এটি একটি মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং শহরটি স্বাধীন হওয়ার এক দশকেরও কম সময় পরে ১৯২১ সালে গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ হিসেবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল।

'২৬ জানুয়ারি ২০২৪ তিনি এক্সহ্যান্ডেল-পোস্টে লিখেছেন, সেন্ট প্যানটেলিমনের চার্চটি ১৪ শতকে থেসালোনিকিতে নির্মিত হয়েছিল, যা একটি মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। ১৫০০ এবং শহরের অটোমান কাদি (বিচারক) ইশাক চেলেবির নামানুসারে নামকরণ করা হয় এবং ১৯১২ সালে শহরটি মুক্ত হলে একটি গির্জা হিসেবে পুনরুদ্ধার করা হয়।' এই দৃষ্টান্তগুলি প্রমাণ করে গ্রিসে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেই আক্রমণকারীদের রেখে যাওয়া কলঙ্কচিহ্ন মুছে দেওয়া হয়েছিল।

আর্নল্ড টয়েনবি এই হিন্দু সমাজের উদারতার কথা লিখেছেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে বারাণসীতে আওরঙ্গজেব কর্তৃক নির্মিত মসজিদ এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে এটিকে সরিয়ে ফেলা উচিত ছিল এবং একটি পোলিশ উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৮১৭ সালে যখন রাশিয়ানরা ওয়ারশ' জয় করে, তারা শুধুমাত্র পোলিশদের অপমান করার জন্য শহরের প্রধান গির্জাটিকে ক্যাথলিক থেকে একটি অর্থোডক্স উপাসনাস্থলে রূপান্তরিত করেছিল। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া হেরে গিয়েছিল এবং পোলান্ড স্বাধীন হয়েছিল তখন পোলিশরা অর্থোডক্স গির্জা ভেঙে দিয়ে রোমান ক্যাথলিক গির্জা পুনর্নির্মাণ করেছিল। টয়েনবি বলেছেন এটা করা হয়েছিল জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য। তিনি নতুন দিল্লিতে একটি আলোচনা সভায় বলে ছিলেন, 'আপনারা পোল্যান্ডের মানুষদের মতো নন। আপনারা অনেক বেশি উদার। আপনারা এখনও তাদের সহ্য করছেন।

সেই জন্য এটা শুধুমাত্র অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের আন্দোলনের কথা নয়। হিন্দু সমাজ ১০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে লড়াই করে আসছে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রথমত, ভারত যুদ্ধ করে এবং বেঁচে থাকে; এটি গ্রিস, পারস্য বা রোম, মেসোপটেমিয়ার মতো ধ্বংস হয়ে যায়নি। ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি এর মূল কারণ হলো এ দেশ আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ। বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতীয়রা এক হয়ে বসবাস করে। একবার ভাবুন যদি ১৯৪৭ সালে হিন্দুসমাজ (অযোধ্যায়) কাঠামোটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিত, কেউ তা থামাতে পারতো না। কিন্তু সে রকম কিছুই করা হয়নি। ভারত আলোচনায় বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসার মাধ্যমে বিষয়গুলো সমাধান করে। যেহেতু অযোধ্যায় মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয়নি, সে জন্যই সেখানে একটি বড়ো আন্দোলন হয়েছিল। অযোধ্যা, কাশী, মথুরা শুধু একটি প্রতীক, কিন্তু এটি কীসের প্রতীক? শ্রীরাম, শিবঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণ যে ঐক্যের প্রতীক আমাদের সকলের এবং সমগ্র বিশ্বের তা বোঝা উচিত।

সেজন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দৃষ্টান্ত টেনেও যোগী আদিত্যনাথ সাংবিধানিক পদ্ধতির কথাই স্মরণ করিয়েছেন। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঠাকুরপুরা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক নিতাইচন্দ্র দে গত ৪ মার্চ পরলোকগমন করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি স্বয়ংসেবক হন। বালুরঘাট মহকুমা কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের জেলা সভাপতি, প্রদেশ সমিতির সদস্য এবং প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কিছু সময় একল অভিযান সমিতিরও দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রবীর বিশ্বাসের মাতৃদেবী বিমলা বিশ্বাস গত ১৪ মার্চ নদীয়া জেলার চাকদহের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

বিশ্বগুরু হওয়ার পথে ভারত

সুদীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায় শাখায় গান বাজছে, 'বিশ্বগুরু ভারত কা ধ্বজ আগে লে কর জায়েঙ্গে'। বস্তুত শতবর্ষ ধরে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের একটাই লক্ষ্য ভারতকে বিশ্বগুরু করে তোলা, বিশ্বমঞ্চে তাঁদের দেশকে নেতৃত্বের যোগ্য করে তোলা। তাঁদের এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়া থেকে খুব দূরে নয়। এবছরের ২৫ জানুয়ারি সংবাদমাধ্যম 'দ্য ডিপ্লোম্যাটে'র প্রতিবেদনে বলা হয়, 'হাজারো সমস্যা সত্ত্বেও ভারত এগিয়ে যাচ্ছে, এর গতিময়তা, চিন্তাভাবনা, বৈচিত্র্য ও ক্রম-পরিবর্তনশীলতা নিয়ে।'

অপর এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যমটি জানায় যে, জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার সুবাদে ভারত ইতিমধ্যেই বিশ্বমঞ্চে গুরুত্ব পেয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লি চীনের নেতৃত্বাধীন সাংহাই কোঅপারেশনের সভাপতিত্বও করেছিল। সেই মাসেই ভারত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন 'কোয়াড' জোটের বরিষ্ঠ কর্মকর্তাদের এক বৈঠকের আয়োজনও করে। এমনিতে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ভারত আন্তর্জাতিক মহলের সমীহ বেশ কিছুদিন যাবৎই আদায় করে নিচ্ছিলো। এখন জনসংখ্যার নিরিখে ভারত 'বিশ্বশক্তি' হওয়ার বাসনা আরও জোরালোভাবে প্রকাশ করতেই পারে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পূর্বাভাস, চলতি বছরের মধ্যে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হবে। 'বিশ্বশক্তি ভারতে'র দিকচিহ্ন অবশ্যই দেশের পার্লামেন্ট ভবন। ভারত দীর্ঘদিন থেকেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার চেষ্টা করছে। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে এই প্রয়াস এখন আরও জোরদার হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

সম্প্রতি মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন'র প্রতিবেদনে ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন-ম্যাডিসনের চীনা জনসংখ্যাতত্ত্ববিদ ই ফুক্সিয়ানের টুইট তুলে ধরা হয়েছে। ফুক্সিয়ান চীনে জন্মহার কমতে থাকায় 'ভারত সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে' বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, 'এখন ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। একদিন দেশটির অর্থনীতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে'। ভারত তার জনগণের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলেও অর্থনীতিজ্ঞদের অভিমত। ভারতে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আলেক্সান্ডার এলিস গত ২৩ জানুয়ারি সংবাদমাধ্যম এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনাল (এএনআই) -কে জানিয়েছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার বিষয়ে ভারতের ইচ্ছার প্রতি লন্ডনের পূর্ণ সমর্থন আছে।

এর আগে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো ভারতের এই ইচ্ছার প্রতি অপর স্থায়ী সদস্য ফ্রান্সের সমর্থনের কথা জানানো হয়েছে। আমেরিকা ও রাশিয়াও ভারতের প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছে। এক্ষেত্রে এখন প্রয়োজন চীনের সমর্থন। দ্য ডিপ্লোম্যাটের প্রতিবেদনে জানা যায়, এক্ষেত্রে চীনের ভূমিকা 'ইতিবাচক' নয় ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘদিনের 'নেতিবাচকতা' থেকে বেরিয়ে আসতে তারাও এবার বাধ্য হবে। গত বছর চীনের সংবাদমাধ্যম 'সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টে'র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, আমেরিকা ও চীনের মধ্যে বর্তমান রেষারেষির মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা 'আসিয়ান' দেশগুলোয় ভারতের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ২০২২-এর তুলনায় বেড়েছে।

> বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গ টেনে বেজিংকে একঘরে করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ায় বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ ভারতের অর্থনীতি আরও গতিশীল হবে এমনটিই আশা করছেন অর্থনীতিজ্ঞরা।

স্টকহোম সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান অ্যান্ড ইন্দো-প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্সের প্রধান জগন্নাথ পণ্ডা সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো ভারতকে বিদ্যমান বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন হিসাবে দেখছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর এমন চাওয়াকে 'বাস্তবসম্মত' বলে মনে করছেন অনেক বিশ্লেষক। গত ৩১ জানুয়ারি 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' জানায়, চীনের সরবরাহ চেইনের বিকল্প হিসেবে ভারতের দিকে ঝুঁকছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশেষ করে, বাইডেন প্রশাসন চীন ও অন্যান্য দেশ থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্ত সরবরাহ চেইন সরিয়ে নিতে ভারতের সহায়তা চাইছে।

বাইডেন প্রশাসনের আশঙ্কা, সেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি বৈশ্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অ-স্থিতিশীল করে তুলতে পারে, সেই সমস্যা সমাধানে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি নিয়মিত বৈঠক করছে। হোয়াইট হাউস চাইছে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থেকে বেজিংকে বিচ্ছিন্ন করে চীনা সেনাবাহিনীর উন্নয়নের গতি ধীর করে দিতে। বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গ টেনে বেজিংকে একঘরে করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ায় বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ ভারতের অর্থনীতি আরও গতিশীল হবে এমনটিই আশা করছেন অর্থনীতিজ্ঞরা।

গত ২৫ জানুয়ারি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'দ্য ইকোনমিক টাইমসে'র এক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল—'সমস্যা নেই, যদি চীন না থাকে তাহলে বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের দেখভাল ভারত করবে।' প্রসঙ্গত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কয়েক হাজার বছরের পুরনো। সেই অঞ্চলের জাতিগুলোর ধর্মীয়- সামাজিক- সাংস্কৃতিক জীবনে ভারতীয়দের প্রভাব সুগভীর। আধুনিক ভারতের পূর্বে বার্মা (মায়ানমার) থেকে আরও পূর্বে ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ-পূর্বে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া হয়ে ফিলিপাইন্স পর্যন্ত দিল্লির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব এখনও বিদ্যমান। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে তারই ফয়দা তুলছে ভারত। □

বঙ্গ রাজনীতিতে শুভ সংকেত

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

মহামতি চাণক্য বলেছিলেন দুষ্ট লোকেদের জন্য সমাজ নষ্ট হয় না, নষ্ট হয় সজ্জন শক্তির নির্লিপ্ততার কারণে। অর্থাৎ যারা ভালো মানুষ, তারা যদি সমাজের ভালো-মন্দ নিয়ে না ভাবেন, সমাজকে ভালো করতে এগিয়ে না আসেন, তবে অসৎ, দুষ্ট লোকেরাই তার শূন্যস্থান পূরণ করবে, সমাজকে কলুষিত করবে। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত ভালো মানুষেরা রাজনীতির আঙিনায় আসতে দ্বিধাবোধ করেছেন। সেই সুযোগে এ রাজ্যের রাজনীতির দখল নিয়েছে দুষ্ট লোকেরা। সমাজের 'হৃদ্‌পিণ্ড' হলো প্রবুদ্ধ সমাজ। তারাই যদি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রাজনীতি থেকে দূরে থাকেন তবে সমাজকে পরিশুদ্ধ করবে কে? অসাধু, অসৎ লোকেরা আজ রাজনীতির দখল নিয়ে রেখেছে, তাই এই রাজ্য ধ্বংসের দোরগোড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের পরিচিতি আজ রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন।

আশির দশকে বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে সমাজবাদের নামে একদল দুর্বৃত্ত রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিল। সে সময় বাহুবলী মস্তানরা বন্দুক কাঁধে দাপিয়ে বেড়াত, ভোটে দাঁড়াত, বিপক্ষ দলের নেতা-কর্মীদের হত্যা করত। লালু আর সাধু যাদব জুটি তো দেশের রাজনীতির ইতিহাসে 'জঙ্গলরাজ'-এর নায়ক নামে কলঙ্কিত হয়ে আছে। রাজনীতিতে গুন্ডারাজের সেই লোমহর্ষক কাহিনি একসময় বলিউডের ফিল্ম নির্মাতাদের সুপারহিট ফিল্মের রসদ জুগিয়েছিল, তৈরি হয়েছিল অজয় দেবগণের 'গঙ্গাজল'। তবে সেই দুর্বৃত্তরা খুব বেশিদিন রাজনীতিতে স্থায়িত্ব লাভ করেনি, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আজ সেসব রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা, খুনোখুনির কথা শোনা যায় না। ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিমবঙ্গ।

১৯৭৭ সালে জ্যোতি বসুরা ক্ষমতায় এলেন। গ্রামের সরলমতি গরিব মানুষকে নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে শুরু হলো 'শ্রেণী সংগ্রাম'। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক খুন-সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছিল এই কমিউনিস্টরাই। এদের দেখে সত্যিকারের শিক্ষিত বাঙ্গালি ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করল। সেই শূন্যস্থান পূরণ করল খুনি-সন্ত্রাসী-দাঙ্গাবাজরা। এরাজ্যের মানুষ নিশ্চয়ই খোকন সেন বা মানিক রায়কে চেনেন না! না চেনারই কথা। সেই সময়টা ১৯৭০ সাল। বর্ধমানে সিপিএম না করার অপরাধে একটি কংগ্রেস পরিবারের উপর চলেছিল নারকীয় হত্যালীলা। পুত্র নবকুমার সাঁইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, তার রক্তমাখা ভাত তার মায়ের মুখে ঠুসে দিয়েছিল এই খোকন আর মানিকরা। পরে এরাই কমরেড নিরুপম সেন, অনিল বসু নামে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও সিপিএমের সাংসদ হয়েছিল। তারপর ৩৪ বছর এদেরই তপন, শুকুর, মজিদ মাস্টার, বিনয় কোঙার, সুশান্ত ঘোষ, লক্ষ্মণ শেঠের মতো কুখ্যাত কমরেডরা মরিচঝাঁপি, আনন্দমার্গী, সূঁচপুর, কেশপুর, নন্দীগ্রাম, নেতাইয়ের মতো গণহত্যার নেতৃত্ব দিয়েছে। এই খুনি, সন্ত্রাসীরা যত রাজনীতির কাছাকাছি এসেছে ততই দূরে চলে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সজ্জন সমাজ।

আজও এর বিরাম ঘটেনি। ২০১১ সালে তৃণমূল সরকারে আসার পর শুধু 'ক্যাপশন'টাই পালটেছে, অবস্থা পালটায়নি। সিপিএমের জমানার অপরাধীরাই আজ শাসকদলের নেতা। সেদিনের টেস্টেড 'OK' কমরেড শাজাহান, শওকত, আরাবুল, মনিরুল্লরাই আজকের শাসকদলের নেতা। তাই পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই যান খুন-ধর্ষণ-নির্বাচনী সন্ত্রাস, যেদিকেই তাকান কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি, চাকরি চুরি, সিবিআই-ইডি, চোর-চোর স্লোগান, নারীর অসম্মান। সর্বত্রই এই শাজাহান, শিবু, উত্তমদের মতো নারী মাংসলোভীদের উপস্থিতি, জমি মাফিয়াদের অবাধ বিচরণ। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে যাদের গর্জে ওঠার কথা সেই সত্যিকারের সজ্জনশক্তি আজ নির্বাক, নির্লিপ্ত।

আজ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত ব্যক্তিরা বঙ্গ রাজনীতিতে এক আশার বার্তা নিয়ে এসেছেন। সে বার্তা হলো আজ জাতির এই সংকট সময়ে প্রবুদ্ধ সমাজের সামনে

জাস্টিস গঙ্গোপাধ্যায় স্বাগত আপনাকে। আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজ্যের আরও প্রবুদ্ধ মানুষ রাজনীতির অঙ্গনে আসুক। পশ্চিমবঙ্গ ফিরে পাক তার হৃতগৌরব।

ফঃ ২

এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু তাঁর বিজেপিতে যোগদান বঙ্গ রাজনীতিতে ফেলেছে শোরগোল। সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল সকলেই তাঁর সমালোচনায় মুখর। একজন প্রাক্তন বিচারপতি কেন রাজনীতিতে যোগদান করবেন? আচ্ছা, জাস্টিস গঙ্গোপাধ্যায় যদি বিজেপিতে যোগ না দিয়ে সিপিএম কিংবা কংগ্রেসে যোগ দিতেন তখন কি এমন সমালোচনা হতো? কালে কালে অনেক বিচারপতিই তো রাজনীতিতে এসেছেন। তখন হইচই হয়নি কেন? কারণ তারা সকলেই বিজেপি বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। আসলে পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে উজ্জ্বল ভাবমূর্তির কেউ বিজেপিতে যোগ দিক এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না। তৃণমূল বলছে তাঁর বিজেপিতে যোগদান প্রমাণ করছে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন না। কিন্তু তারা চতুরতার সঙ্গে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল যে তাঁর দেওয়া প্রত্যেকটি রায় ডিভিশন বেঞ্চে, সুপ্রিম কোর্টে এই তৃণমূল সরকার আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা চ্যালেঞ্জ করেছে। সুপ্রিম কোর্টও শেষ পর্যন্ত সেই নির্দেশ বহাল রেখেছে। অর্থাৎ আইনের মানদণ্ডে সেগুলি ভ্যালিড বা রিজিনড্ অর্ডার (যুক্তিসঙ্গত রায়) বলে প্রমাণিত।

রাজনৈতিক দলগুলির কথা ছেড়েই দিন, পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটা বড়ো অংশও তাঁর এই সিদ্ধান্তে বেজায় ক্ষুব্ধ। তাদের মতে একজন প্রাক্তন বিচারপতির এভাবে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান অনুচিত। কেন? একজন বিচারপতি কি মানুষ নন? তিনি কি এদেশের ভোটার নন? তাঁর কি বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোটদানের অধিকার নেই? অবসর গ্রহণের পর তিনি যদি তাঁর পছন্দের সেই দলটিতে যুক্ত হতে চান, তবে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হবে? এমন ঘটনা কি এদেশে প্রথম ঘটলো? কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি নূরে আলম চৌধুরী যখন অবসর গ্রহণের পর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে মুরারই কেন্দ্র থেকে জিতে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী হন, অথবা নব্বইয়ের দশকে সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস কে সুব্বারাও যখন অবসর গ্রহণের পর কংগ্রেসে যোগ দেন, বা ২০১৮ সালে বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভয় থিপসে যখন কংগ্রেসের নেতা বনে যান, নতুবা বিজয় বহুগুণা যখন এলাহাবাদ ও বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতির দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণের পর কংগ্রেসে যোগ দিয়ে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান— তখন ন্যায়নীতির কথা কোথায় থাকে? এরকম উদাহরণ এদেশে তো নতুন নয়, ভুরি ভুরি আছে।

যে মানুষটির জন্য রাজ্যবাসী আজ জানতে পেরেছে এক শিক্ষামন্ত্রী তার বান্ধবীর ফ্ল্যাটের খাটের তলায় পঞ্চাশ কোটি টাকা জমিয়ে রেখেছে, যে মানুষটির জন্য এরাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা জানতে পেরেছে কীভাবে OMR শিট বদল করে তাদের হকের চাকরি পার্টির ক্যাডাররা লুঠ করেছে, যে মানুষটির জন্য গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা জানতে পেরেছে রেশন দুর্নীতিতে কীভাবে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যে মানুষটির জন্য সাধারণ মানুষ জানতে পেরেছে কয়লা-বালি- গোরু-পাচারের টাকায় পার্টির নেতারা কীভাবে বিপুল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, যে মানুষটির জন্য শিক্ষিত বেকাররা জানতে পেরেছে পুরসভার পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির কথা, পুর নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির কথা— তিনি রাজনীতিতে এলে এই বুদ্ধিজীবীদের মতো সরকারি উচ্ছিষ্টভোগীদের কষ্ট হওয়াই তো স্বাভাবিক। গত ৫০ বছরে এ রাজ্যে তো কম দুর্নীতি সামনে আসেনি। কিন্তু তার তদন্তের ফল কোথায়? আজকে যখন তাঁর নির্দেশে একটার পর একটা চোর ধরা পড়েছে, অপরাধীরা জেলের ঘানি টানছে, রাগ তো তখন হবেই। আজ তিনি যখন এজলাসে বসে রাজ্যের যুবক-যুবতীদের পক্ষে রায় দিয়েছেন, তখন তিনি তাদের কাছে ভগবানের আসন লাভ করেছেন। আর যারা তাঁর রায়ে জেলের মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছেন বা খাচ্ছেন, তাদের চোখে হয়েছেন ঘোর শত্রু। তাই তাঁকে 'বিজেপির এজেন্ট' বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

আসলে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আইনি ব্যবস্থার মধ্যে থেকে একজন সমাজ সংস্কারকের কাজ করেছেন। যে কাজ রাজনৈতিক নেতাদের করা উচিত ছিল সেটা একজন বিচারপতি হিসেবে করে দেখিয়েছেন। এই চোর-জোচ্চোর-খুনি-ধর্ষকদের সমর্থকরা চান না সমাজ ভালো হোক, উন্নত হোক, কলঙ্ক মুক্ত হোক। তারা চান না এই পূতিগন্ধময় রাজনৈতিক ব্যবস্থাটার পরিবর্তন ঘটুক, সমাজের প্রবুদ্ধ মানুষরা সামনে আসুক। তাই তারা কর্ম-অবসরে তাঁর এই বিজেপিতে যোগদানের বিরোধিতা করছেন। তবে জাস্টিস গঙ্গোপাধ্যায় আপনি সঠিক কাজই করেছেন। আপনার এই সিদ্ধান্তের যত সমালোচনাই হোক, রাজ্যবাসী আজ বলছে 'তারা একজন প্রকৃত মানুষকে পাশে পেয়েছে'। স্বাগত আপনাকে। আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজ্যের আরও প্রবুদ্ধ মানুষ রাজনীতির অঙ্গনে আসুক। পশ্চিমবঙ্গ ফিরে পাক তার হৃতগৌরব। ◻

With Best Compliments from -

A Well Wisher

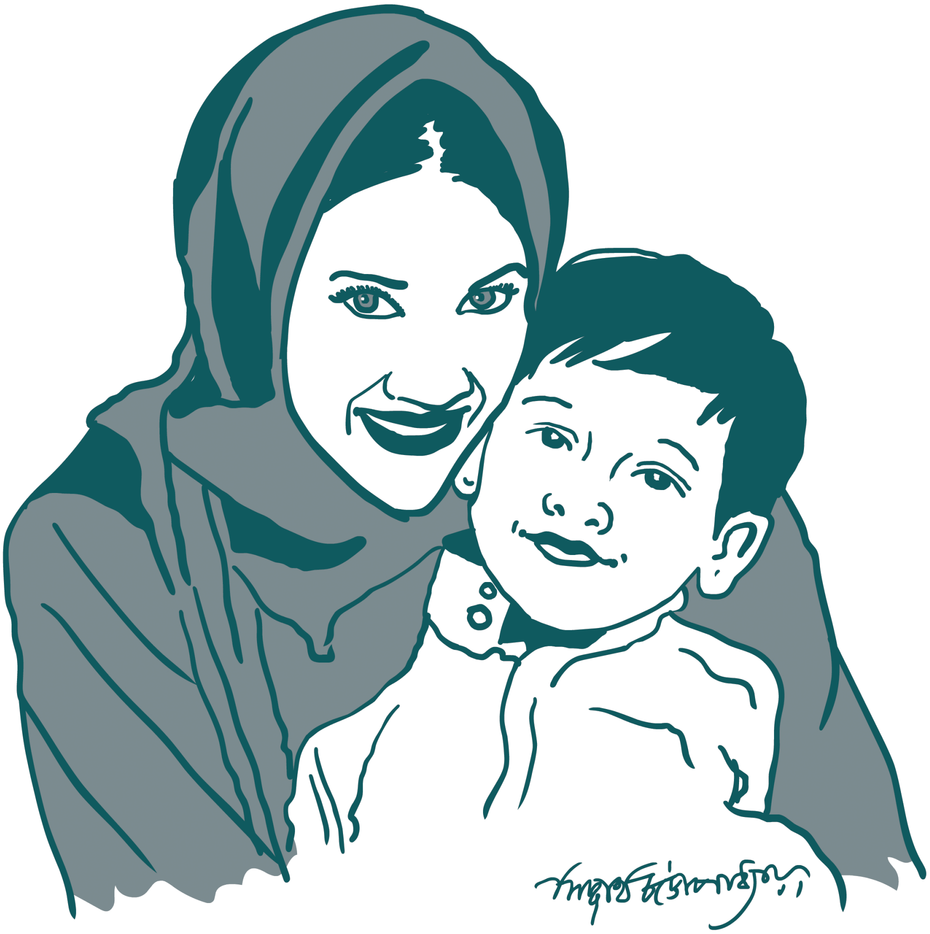

আশা

রাকেশ দাশ

বাবার চতুর্থ পত্নীর তৃতীয় কন্যা জরীনা। ভাই-বোনদের মধ্যে ত্রয়োদশ। তার জন্মের সময় তার মায়ের বয়স সাতাশ, বাবার সাতচল্লিশ। তাদের বাড়ি অনেক বড়ো। মুম্বাই নগরীতে এই বাড়ি রাজপ্রাসাদের সমান। বাড়িতে দশখানি ঘর। অনেক লোকের বাস। জরীনার পরেও তার বাবার আরও দুটি সন্তান হয়েছে। মোট পনেরো ভাই-বোন তারা। আট বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো সে। চার মা। সবার বড়ো দুই ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে। তাদের আবার একটি করে ছেলে।

বাবার নামকরা দোকান। সেই দোকানেই বড়ো তিন ভাই বাবার কাজে সাহায্য করে। আরেক ভাই নিজের ব্যবসা শুরু করেছে। তিন বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মেজো বোনটার এর মধ্যে তালাকও হয়ে গিয়েছে। বাবা আর ভাইদের চোখের বালি হয়ে সে দাসীর মতো এই বাড়িতেই জীবন কাটায়। বাকি ভাই-বোনেরা সব মাদ্রাসায় নানা শ্রেণীতে পড়াশোনা করে।

জ্ঞান হওয়া ইস্তক জরীনার একটিই স্বপ্ন—সতীন বিহীন স্বামীর ঘরে স্বামীর সহচরী হয়ে সারা জীবন কাটানো। তার মা ফাতিমার শেষ সন্তান সে। জরীনার জন্মের সময় ফাতিমার শরীরে কোনো এক সমস্যা

দেখা দেয়। ফলে সে আর গর্ভধারণ করতে পারবে না। জরীনার উপরে দুই ভাই। ছোটোবেলা থেকে সেই জনাকীর্ণ বাড়িটির ঘুপচি স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে প্রতি রাতে মায়ের আঁচল ধরে শুয়ে জরীনা মায়ের নীরব অশ্রুধারা দেখে আসছে। খুব ছোট্টোবেলায় মায়ের চোখের জলের কারণ সে বুঝত না।

কৈশোরে এসে সবই বুঝতে শিখেছে সে। চিকিৎসার অতীত রোগে পীড়িত ব্যক্তির আত্মীয়রা অনেক সময় রোগীর শীঘ্র মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু, নিজের সুস্থ মায়ের মৃত্যু কামনা করে এমন ব্যক্তি জগতে জরীনা ছাড়া বোধহয় অন্য কেউ নেই। প্রতি রাতে মায়ের চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে মিশে যায় আল্লার উদ্দেশে নিজের মায়ের মৃত্যুকামনা করে কাতর প্রার্থনা। বাবা দ্বীনের প্রতি প্রচণ্ড নিষ্ঠাবান। বাবার কঠোর শাসনে বাড়িতে সবাই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। প্রতিবার নামাজে বসে জরীনা আল্লার কাছে একটাই কামনা করে—তার মাকে এই নরকের জীবন থেকে মুক্তি দিক আল্লা। রোজার মাসে সমস্ত রোজার ফল আল্লার উদ্দেশে নিবেদন করে জরীনা কামনা করে মায়ের এই নারকীয় জীবনের সমাপ্তি। যদি মরণেই এই যন্ত্রণার অবসান ঘটে, তবে মরুক সে।

তখন সদ্য শৈশব থেকে কৈশোরে প্রবেশ করেছে জরীনা। এক রাতে হালকা শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। পাশে হাত বুলিয়ে মাকে খোঁজে সে। পায় না মাকে। ভয়ে চোখ খুলে সামনে তাকায়। আলতো করে ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করা অল্প আলোয় খাটের এক কোণায় কাউকে দেখে জরীনা। ভয়ে চীৎকার করে মাকে ডাকতে যায়, কিন্তু শুকনো গলা থেকে শব্দ বেরোয় না তার। অনেকক্ষণ ধরে সেই অস্পষ্ট কলেবরটিকে দেখতে থাকে সে। কতকগুলি অস্পষ্ট শব্দ কানে ঢোকে। তার মধ্যে মায়ের গলা চিনতে পারে সে। আরেকটি গলা কোনো পুরুষের। খুব সাবধানে শুনে জরীনা বুঝতে পারে সেই গলাটি সবার বড়ো দাদার। কিছুক্ষণ পরে দ্রুতপদে কেউ একজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার পিছন পিছন মাও বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে মা ফিরে এসে ঘাটে শুয়ে জরীনাকে ঘুমন্ত ভেবে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে। মায়ের গভীর আলিঙ্গনে মায়ের সারা গায়ে সাবানের মৃদু গন্ধ আর শীতলতা অনুভব করে জরীনা। মা সদ্য স্নান করে এসেছে। শিথিল কণ্ঠে জারীনা ডেকে ওঠে, 'মা!' ফাতিমার আলিঙ্গন শিথিল হয়ে আসে। কিছুক্ষণের জন্য পাথর হয়ে যায় সে। ভয়ে জরীনা মাকে ছোট্টো দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে জোরে। তার কোমল ঠোঁটদুটি আলতো করে স্পর্শ করে মায়ের স্তনবৃন্ত। সেই রাতেই মায়ের চোখ থেকে অঝোরে ঝরতে থাকা অশ্রুধারার স্পর্শ অনুভব করে জরীনা। তার পর থেকে প্রতি রাতে সে দেরি করে ঘুমায়। খাটে শুয়ে ঘুমানোর ভান করে, কিন্তু ঘুমায় না। সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন সেই ঘরে রাত্রিতে দোজখের আগুন প্রত্যক্ষ করে আসছে সে। তার বড়ো দুই দাদা জঘন্য আদিম রিপুর সাকার রূপ ধরে সেই ঘরে ফিরে ফিরে আসে। তাদের দ্বারা নিরুপায় মায়ের প্রতিবাদহীন বলাৎকার নিজের চোখে দেখে জরীনা। স্তম্ভিত হয়ে দেখে, তার চোখ থেকেও অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। কুকুর যেমন আধখাওয়া হাড়ের টুকুরো ফেলে চলে যায়, তেমনই দাদাদের রিরংসা মিটে গেলে মাকে ফেলে তারা চলে যায়। মা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার রাতেও সাবান মেখে স্নান করে এসে জরীনাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে খাটে পড়ে থাকে। নীরবে তার চোখের জল ঝরে। জরীনা অতি কষ্টে নিজের চোখের জল আটকে মায়ের শরীরের কাপড় সরিয়ে স্নানশীতল, কোমল শরীরটিতে নিজের কোমল হাতদুটি বুলিয়ে দিয়ে ভুলিয়ে দিতে চায় নারকীয় যন্ত্রণা। জরীনার হাতের স্পর্শেই বোধহয় যন্ত্রণা ভুলে ঘুমিয়ে পড়ে ফাতিমা।

****

ফাতিমার গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার পরে বাবা তাকে ত্যাগ করেছিল। বাবার পায়ে পড়ে কোনোক্রমে সেই বাড়িতে দাসীর মতো থাকার অনুমতিটুকু আদায় করতে পেরেছিল ফাতিমা। দ্বীনের প্রতি প্রবল নিষ্ঠাবান বাবার মনোভাব স্পষ্ট। সন্তানের জন্ম দিয়ে মোমিনের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমেই আল্লার খিদমত হয়। এই ভাবনা নিয়েই চার বিবিকে নিকাহ্ করেছে সে। ছোটো বিবি ফাতিমা। সেই সবচেয়ে কমবয়সি বিবি যদি সন্তানের জন্ম দিতেই অক্ষম হয় তবে তার সঙ্গে নিকাহ্ করার মানে কী? নিষ্ফল দাম্পত্য টেকে কী করে? বাবা তিনবার তালাক বলে ফাতিমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। সেই সময়ে মায়ের এক সতীন তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে বাড়িতে থাকার উপায় বাতলে দেয়।

ফাতিমা নিজের ভাগের রাতগুলির বিনিময়ে ছোট্টো কন্যাসন্তানটিকে নিয়ে এই বাড়িতে থাকার ব্যবস্থাটুকু করে নেয়। কিন্তু তার উদ্ভিন্নযৌবন শরীরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ছিল প্রায় সমবয়স্ক দুই সৎ ছেলের। তারা জোর করে পালা করে প্রায় প্রতি রাতেই ফাতিমার শরীরটিকে ছিঁড়ে খেতে থাকে। ফাতিমার জীবনে দোজখের আগুন নেমে আসে। সেই দোজখের আগুনের আঁচে জ্বলতে থাকা জরীনার জীবনের স্বপ্ন হয়ে ওঠে সতীনহীন স্বামীর ঘর, যেখানে তার আব্রু সুরক্ষিত থাকবে।

***

একদিন জরীনার নিকাহের সম্বন্ধ এল। ফেরদৌস থেকে এসেছিল সেই সম্বন্ধ। পাত্র পাকিস্তানি। বাড়ির সকলের বদ্ধমূল ধারণা যে, পাকিস্তান ফেরদৌসের থেকে কম কিছু নয়। ফেরদৌস থেকে জরীনার নিকাহের সম্বন্ধ আসার কারণে অন্তঃপুরে চাপা ঈর্ষামিশ্রিত আনন্দের লহর। পাত্র সদ্য কৈশোরের কাঠগড়া পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে। পিঙ্গল দুটি চোখ। পিঙ্গল বর্ণের কোঁকরানো চুলে মাথা ভরা। তেমনই পিঙ্গলাভ সুবিন্যস্ত দাড়িতে সুষমামণ্ডিত মুখমণ্ডল। পাকিস্তানে তার বড়ো ব্যবসা। মাসে লক্ষাধিক টাকা রোজগার। এই সমস্ত কথা জরীনার পরিবার জেনেছিল ঘটকের মাধ্যমে। প্রাসাদোপম নিজস্ব অট্টালিকা। বাড়িতে কেবল বিধবা মা। এই তার প্রথম নিকাহ্।

জরীনার স্বপ্ন যে সাকার রূপ ধারণ করতে শুরু করেছিল। বাড়ির লোকদের আনন্দের সীমা নেই। তাদের বাড়ি থেকে একজন অন্তত ফেরদৌসের সমতুল পাকিস্তানে যেতে পারছে এই ভেবে বাবার মনেও আনন্দের সীমা নেই। আনন্দের আতিশয্যে একটি সোনার হার উপহার দিলেন তিনি জরীনাকে। জীবনে প্রথমবার বাবার হাত থেকে উপহার পেল এই বাড়ির কোনো কন্যাসন্তান। অবশ্য বাবার আনন্দের একমাত্র কারণ পাকিস্তানি জামাই। এই একটি সম্বন্ধের কারণে তার পরিবার পুরো সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে। স্বদেশাভিমানে হবুজামাইয়ের মাটিতে পা পড়ে না। এই দারুল-হরব দেশের সমস্ত কিছুই যে নিকৃষ্ট সেই কথা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ সে হাতছাড়া করে না। তাতে শ্বশুরবাড়িতেও তার কদর বাড়ে। এমনকী তার

শ্বশুরবাড়ির মানুষদের দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠাতেও যে কত রকম খুঁত আছে সেটা বুঝিয়ে দিতে সে কোনো ফাঁক রাখে না। দ্বীন সম্বন্ধে হবুজামাইয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের বহরে শ্বশুর নিজের হীনতাতেও আনন্দ অনুভব করে।

মহা সমারোহে নিকাহ্ হয়ে গেল। পাকিস্তান থেকে বরের একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় মাত্র এসেছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করে নিকাহ্ করানো হয়েছিল। ভিসা ইত্যাদির কারণে বরপক্ষের বেশি লোকের আসা সম্ভব ছিল না। বিদায়ের সময়ে মায়ের সান্নিধ্য ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ এবং নিজের সুখী সংসারের স্বপ্নের আনন্দ মিলেমিশে এক অদ্ভুত আবেগ জরীনাকে ঘিরে ধরেছিল। চোখের জলে হৃদয়ের টুকরো মেয়েকে বিদায় দিল ফাতিমা।

জরীনা তার শোহর ইয়াকুবের সঙ্গে ফেরদৌসের পথে পাড়ি দিল। তার বাড়ি থেকে অন্য কারও অন্য দেশে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না বলে জরীনাকে একাই ইয়াকুবের সঙ্গে রওনা দিতে হলো। নিজের চিরপরিচিত দেশ, নগর, বাড়ি, পরিবার থেকে দূরে সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা এক নতুন দেশে, নতুন পরিস্থিতিতে কোনোরকম বিপদের ক্ষীণ সম্ভাবনাও জরীনার মনের কোণে উঁকি মারতে পারেনি। কারণ তার হৃদয়ের সম্পূর্ণটাকে অধিকার করেছিল ভবিষ্যৎ সংসারের স্বপ্ন।

পাকিস্তানে পৌঁছে আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা জরীনা একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দুতলা ছোট্টো বাড়ি। মাসে লক্ষ টাকা রোজগার করা কোনো ব্যবসায়ীর বাড়ির মতো মোটেই নয়। বাড়ির দরজায় এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়েছিলেন---ইয়াকুবের মা। বাড়ির নীচতলায় দুটি ঘর। একটি অপরটির তুলনায় বড়ো। সেখানে তিনটি সেলাই মেশিন। ঘরে এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে কাপড়ের ব্যাগ। উপর তলায় তিনটি থাকার ঘর, রান্নাঘর ও স্নানঘর। নীচতলার অন্য ঘরটি ব্যাগ বানানোর কাপড় রাখার গুদাম বলে জরীনা পরে জানতে পেরেছিল।

স্বপ্ন শুরু হওয়ার আগেই যেন স্বপ্ন ভাঙতে শুরু করেছিল। ইয়াকুব বাড়িতে ব্যাগ সেলাই করে। তার কাছে আরেকজন কারিগর কাজ করে। বড়ো ব্যাগের কোম্পানির বরাত মতো সে ব্যাগ সেলাই করে। মাসে বড়োজোর পনেরো হাজার টাকা আয় করে সে। মাসে লক্ষ টাকা উপার্জনের কাহিনিতে বিন্দুমাত্র সত্যতা ছিল না। ইয়াকুবের মা এই বাড়ির মালিকের চতুর্থ বিবি ছিলেন। অন্য বিবিদের তালাক দেওয়ার পরে বৃদ্ধবয়সে এই বিবিকে নিকাহ্ করেছিলেন ইয়াকুবের বাবা। ইয়াকুবের মায়ের আগে অন্য একজনের সঙ্গে নিকাহ্ হয়েছিল। এই বাড়িতে সে দাসীর কাজ করত। আগের শোহর তালাক দেওয়ার পরে এই বাড়ির জরাজীর্ণ মালিক ইয়াকুবের মায়ের সঙ্গে নিকাহ্ করে। শর্ত ছিল বাকি জীবন ইয়াকুবের মা তার সেবা করবে। ইয়াকুব তার মায়ের আগের পক্ষের সন্তান। মৃত্যুর আগে ইয়াকুবকেই এই বাড়ি এবং অল্প কিছু জমানো টাকা উইল করে দিয়ে গিয়েছেন সেই বৃদ্ধ। মাদ্রাসায় অল্প কিছু পড়াশোনা করা ইয়াকুব মায়ের মৃত শোহরের কাছ থেকে পাওয়া টাকায় সেলাই মেশিন কিনে জীবিকা নির্বাহ করে।

প্রথম রাতেই ভীতসন্ত্রস্ত জরীনা ইয়াকুবকে প্রশ্ন করে তার ব্যবসার ব্যাপারে। তখনই ইয়াকুব এই সমস্ত ঘটনা জরীনাকে জানায়। তারপরেই কঠিন দৃষ্টিতে, কঠোর স্বরে তাকে আদেশ করে, ''এই সব কথা যেন হিন্দুস্থানে তোমার বাড়ির লোক না জানতে পারে। আমি লক্ষপতি, আর তুমি একটা প্রাসাদের বেগম—এটাই যেন সেখানকার লোকের কানে পৌঁছায়।''

জরীনার এই আদেশ লঙ্ঘনের কোনো ইচ্ছা ছিল কিনা সেটা তাকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যেত। কিন্তু বাস্তবিক পরিস্থিতি হলো, এই আদেশ লঙ্ঘনের কোনো সুযোগ তার ছিল না। ভারত ছেড়ে আসার আগে তার মা তার হাতে কিছু টাকা দিয়েছিল। সেগুলি হিন্দুস্থানি টাকা। এই দেশে তার মূল্য ছেঁড়া কাগজের থেকে বেশি কিছু নয়। তার একটি মোবাইল ফোনও জুটেছিল। সেই মোবাইলে একটি পাকিস্তানি সিমও ছিল। কিন্তু বিদেশে ফোন করার খরচ জোটানোর মতো টাকা তার হাতে ছিল না। ধীরে ধীরে সব গা-সওয়া হয়ে গেল। ইয়াকুবের রুগ্ন মা তার নিকাহের ছয় মাসের মাথায় মারা যায়। সারাদিন বাড়ির সমস্ত কাজ করে ক্লান্ত শরীরে জরীনা রাতে ইয়াকুবের কামজ্বালা শান্ত করে দুচোখের পাতা এক করে। কদাচিৎ ইয়াকুবের কৃপায় হিন্দুস্থানে পরিবারের লোকদের সঙ্গে ফোনে কিছু কথাবার্তা হয়ে থাকে। বাড়িতে কেবল দুজন তার সঙ্গে কথা বলতে উৎসাহ বোধ করে---ফাতিমা ও জরীনার সেই তালাকশুদা দিদি। কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলার বিশেষ সুযোগ জরীনা পায় না। যে দাদারা সারাজীবন তার অস্তিত্বটুকুকেও স্বীকৃতি দেয়নি তারা প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মুম্বাই ছেড়ে পাকিস্তানে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য জামাইকে অনুরোধ করার জন্য উপরোধ করে জরীনার কাছে। তাদের উৎপাতে কদাচিৎ মা এবং সেই দিদির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায় জরীনা। কথাবার্তা যেটুকু হয় সেটুকু ইয়াকুবের সামনেই। নিকাহের এক বছর যেতে না যেতেই জরীনা অন্তঃসত্ত্বা হয়। ইয়াকুব হিন্দুস্থানে শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠায়। বাড়ি থেকে সকলে শুভকামনা জানায়।

গর্ভাবস্থাতেও বাড়ির সমস্ত কাজই জরীনাকেই করতে হয়। প্রায়ই রাতে ইয়াকুবের কামজ্বালাও শান্ত করতে হয়। ঠিক সময়েই তার একটি মেয়ে হয়। অনেক আশা নিয়ে জরীনা মেয়ের নাম রাখে— 'আরজূ'— মানে আশা। ইয়াকুবের মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। মেয়ের জন্মের পরে চিকিৎসকদের বিধিনিষেধ মেনে মাস চারেক সাংসারিক কাজের চাপ কিছুটা হালকা হয় তার। তার পরে আবার আগের গতানুগতিক জীবন। মেয়ের দেখাশোনা কিংবা সাংসারিক কাজ--- কোনোটাতেই ইয়াকুবের কোনোরকম সাহায্য পাওয়া যায় না।

ইয়াকুবের কাছে জরীনা একটি সজীব সম্পত্তি—ক্রীতদাসী। সে ইয়াকুবের সংসার সামলাবে, কামজ্বালা শান্ত করবে। তার নিজের কোনো ইচ্ছা বা বাসনা থাকতে পারে না। ইয়াকুব তাকে যখন যেমন বলবে জরীনা তখন তেমনটা করতে বাধ্য। এভাবেই জীবন কাটাছিল জরীনার। তার সম্পূর্ণ জীবনে একটিই সান্ত্বনা—তার কোনো সতীন নেই।

মেয়ের বয়স যখন দেড় বছর তখন ইয়াকুবের সেলাই কারখানায় একটি মেয়ে কাজ করতে এল। আগে যে লোকটি কাজ করত তারই সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রী আয়েশা। ইয়াকুবের কারখানায় একটা মেশিন এমনিই পড়েছিল। সেই মেশিনটি এবার সচল হলো। এক মাস পরে হঠাৎ আয়েশার শোহর আয়েশাকে তালাক দিল।

তার তিন মাস পরে হঠাৎ এক রাতে জরীনাকে ইয়াকুব জানাল যে, তালাকশুদা আয়েশার সঙ্গে সে নিকাহ্ করবে। জরীনার

মাথায় বজ্রপাত হলো। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা গেল সে। যখন জ্ঞান ফিরল তখন তার বিছানার পাশে আয়েশা এবং তার প্রাক্তন শোহর অর্থাৎ ইয়াকুবের সেই কর্মচারীকে দেখতে পেল।

সেই কর্মচারীর কাছ থেকে সে এক বিচিত্র কাহিনি শুনল। যে রাগের মাথায় আয়েশাকে তালাক দিয়েছে বটে। কিন্তু এখন সে পশ্চাত্তাপ করছে। সে পুনরায় আয়েশার সঙ্গে ঘর করতে চায়। কিন্তু তাতে দ্বীনের নিষেধ আছে। একমাত্র পথ হলো নিকাহ্ হালালা। অর্থাৎ, অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে আয়েশার নিকাহ্ হবে। সেই পুরুষ যদি স্বেচ্ছায় আয়েশাকে তালাক দেয় তবে তার পরেই পুরোনো শোহরের সঙ্গে নিকাহ্ করতে পারবে আয়েশা। ইয়াকুব ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে সে ভরসা করতে পারছে না। সেজন্য এই দম্পতির ত্রাণকর্তা হিসাবে ইয়াকুবের আবির্ভাব।

নিকাহ্ হালালা সম্বন্ধে জরীনাও শুনেছিল আগেই। সে জানত যে এই নিকাহ্ কেবল নামমাত্র নিকাহ্ নয়। দুজনকে দাম্পত্য পালন করতে হবে। শারীরিকভাবে মিলিত হতে হবে। তা নাহলে আল্লার কাছে গোনাহ্ হবে। তাৎপর্য পরিষ্কার—ইয়াকুব দ্বিতীয়বার নিকাহ্ করতে চলেছে। পরের দিনই বাড়িতে কাজিসাহেব এলেন। আয়েশার সঙ্গে ইয়াকুবের নিকাহ্ হয়ে গেল। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো সেই নিকাহে ইয়াকুবের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকতে হলো জরীনাকে। তাতেই যন্ত্রণা মেটে না। দাওয়াতে উপস্থিত সকলের জন্য বিরিয়ানি রান্নার দায়িত্বও জরীনাকেই পালন করতে হলো।

জীবনের আর কোনো মানে ছিল না জারীনার কাছে। কেন বাঁচব—এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না তার কাছে। রান্নাঘরে বিরিয়ানির হাঁড়িতে তার জীবনটিকেই ফুটন্ত জলে সিদ্ধ হতে দেখছিল সে। রাতে জরীনার এতদিনের ঘরটিতে আয়েশার সঙ্গে ঢুকল ইয়াকুব। অন্য একটি ঘরে মেয়েকে কোলে নিয়ে ঢুকল জরীনা। ইয়াকুবের ঘরের আলো নিভল। সেই ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন রাত্রিতে এক পলের জন্যও জরীনার চোখ থেকে অশ্রুপ্রবাহ থামল না। এক দণ্ডের জন্যই দুই চোখের পাতা এক করতে পারল না জরীনা। চোখ বন্ধ করলেই চোখের সামনে এক নিদারুণ দৃশ্য এসে উপস্থিত হয়েছিল—দাদাদের দ্বারা মায়ের ধর্ষণের দৃশ্য। ভোরের কিছু আগে ঘরে সিলিং ফ্যানে একটি কাপড় জড়িয়ে কাপড়ের অন্য প্রান্তটি যখন গলায় জড়িয়েছে জরীনা তখন অরজু হঠাৎ কেঁদে উঠল। জরীনা চমকে উঠল। গলা থেকে তড়িঘড়ি কাপড় খুলে মেয়ের মুখে স্তনবৃন্ত গুঁজে দিল সে। সেই ঘোর অন্ধকারে জীবনের সবচেয়ে জটিল সমস্যার সমাধান দেখা দিল তার কাছে।

সেই সমস্ত অমানিশাগুলিতে ঘৃণিত পশুর সমান দাদাদের দ্বারা ছিঁড়ে খাওয়া মায়ের কোমল শরীরটাতে হাত বোলাতে বোলাতে জরীনা ভাবত—'কেন এমন ভাবে প্রতিটা রাতে নিজেকে ধ্বংস করেও এই বাড়িতে পড়ে আছে মা? কী পায় সে? কেন নিজেকে শেষ করে ফেলে না? মৃত্যুর যদি এত ভয় তবে বাড়ি ছেড়ে পালায় না কেন? জীবিকার চিন্তা করে তো লাভ নেই। প্রতি রাতে এখানে যা করছে সেই কাজই তো বাইরে গিয়ে করলে জীবিকা চলে যায়। তাতে অন্তত কিছুটা স্বাধীনতা থাকে!' আজ নিজের কোলে স্তন্যপানরতা কন্যাটির মুখের দিকে তাকিয়ে সে এই অনুত্তরিত প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পায়। জরীনার জন্যই ফাতিমার মরার বা পালানোর উপায় ছিল না। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই ফাতিমা সমস্ত কিছু মুখ বুজে সহ্য করত বলে উপলব্ধি করে জরীনা। মেয়ের মায়াময় মুখটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড শান্তি পায় জরীনা। আরজুর মুখে সে নতুন আশার কিরণ দেখতে পায়। কষ্ট কমে না, কিন্তু অসীম সহ্যশক্তি তার মধ্যে কোথা থেকে যেন প্রবেশ করে।

বাড়িতে জরীনার অবস্থা আগের মতোই। সারাদিন সংসারের কাজ। কেবল রাতে ইয়াকুবের কামুকতার শিকার হয় না। মাসের যে কয়েকটা দিন আয়েশা রজস্বলা হয় সেই রাত্রিগুলিতেই ইয়াকুব জরীনার কাছে আসে। মজহবি নিয়মে প্রত্যেক বিবির সঙ্গে সমান সংখ্যক রাত্রিযাপন করার কথা শোহরের। কিন্তু, মজহবি নিয়মে যদি বিবি নিজের পালার রাত্রিগুলি শোহরের প্রিয় বিবিকে দান করে তবে শোয়াব আছে। জরীনার মা ফাতিমাও এটাই করেছিল। সেই শিক্ষা জরীনাও পেয়েছিল। শোয়াবের আশায় রাত্রিগুলি আয়েশার কাছে বিক্রি করত সে। আয়েশা কিন্তু আগের মতোই ইয়াকুবের কারখানায় সেলাইয়ের কাজ করছিল। তার জন্য সে টাকাও পেত। সেখান থেকে কিছু টাকা আয়েশা জরীনার হাতেও দিত লুকিয়ে লুকিয়ে।

এক বছর পরে আয়েশাও গর্ভবতী হলো। জরীনা বুঝতে পেরেছিল যে, ইয়াকুব আয়েশাকে তালাক দেবে না। ইয়াকুব আয়েশাকে তালাক দিক জরীনারও ইচ্ছা ছিল না। তা সত্ত্বেও একদিন সে আয়েশার সঙ্গে তার আগের শোহরের পুনরায় নিকাহের প্রসঙ্গ এবং নিকাহ্ হালালার প্রসঙ্গ তুলে ইয়াকুবকে জিজ্ঞাসা করেছিল কবে সে আয়েশাকে তালাক দেবে। প্রচণ্ড এক থাপ্পড়ের আঘাতে মাটিতে ছিটকে পড়েছিল জরীনা। কানে কতগুলি কুৎসিত গালাগালির পরে কয়েকটা শব্দ প্রবেশ করল, ''রেন্ডি মাগি, একটা ছেলে বিয়ানোর ক্ষমতা নেই, অন্য বিবিকে তালাক দেওয়ার কথা বলছিস কোন মুখে? পাপগর্ভা, রাক্ষসী.....মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।'' শূন্যদৃষ্টিতে ইয়াকুবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে জরীনা। মাদ্রাসার পড়া মনে পড়ে—স্বামীর সঙ্গে কলহ করলে আল্লার কোপে পড়তে হয়। কলহকারিণী, ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে সৎপথে আনার জন্য স্বামী যদি পেটায় তাতে কোনো দোষ নেই। ইয়াকুব দ্বীনের প্রতি আস্থাশীল। তার আচরণে কোনো দোষ খুঁজে পায় না জরীনা। চুপচাপ উঠে রান্নাঘরে ঢোকে। রাতে তার কাছে আদেশ আসে অন্তঃসত্ত্বা আয়েশার সেবার জন্য। শীতল দৃষ্টিতে আয়েশা ও ইয়াকুবের মুখের দিকে তাকায় সে। দুজনেই বুঝতে পারে যে, জরীনা এই আদেশ মানবে না। খেতে খেতে ইয়াকুব জরীনাকে উদ্দেশ্য করে তিনবার উচ্চারণ করে–– তালাক ,তালাক, তালাক। আয়েশার মুখ থেকে রুটির টুকরো পড়ে যায়। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে জরীনার মুখের দিকে। জরীনার মুখে কোনো ভাবলেশ দেখতে পায় না সে। চুপচাপ খাওয়া শেষ করে বাড়ির বাকি কাজ শেষ করে জরীনা নিজের কামরায় ঢোকে।

***

পরেরদিন সকালে অনুতপ্ত মুখে জরীনার কাছে আসে ইয়াকুব। মজহবি নিয়মে তিন তালাকের পরেও তৃতীয় ঋতুস্নানের মধ্যে বিবিকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে শোহর। রাতের কথা ভুলে আগের মতোই দাম্পত্য নির্বাহের অনুরোধ জানায় ইয়াকুব। জরীনা কাটা কাটা উচ্চারণে বলে, 'আয়েশাকে তালাক দাও, নাহলে আমাকে ছেড়ে দাও। আমার তোমার সঙ্গে ঘর করার আর কোনো ইচ্ছাই নেই।' ইয়াকুবের চোখ জ্বলে ওঠে। এইভাবে

এক জেনানা তার সামনে কথা বলতে পারে এমনটি তার ধারণার বাইরে ছিল। প্রচণ্ড চীৎকার করে ইয়াকুব জানিয়ে দেয় যে, সে এর পরে জরীনার মুখদর্শন করতে চায় না। জরীনা যেন তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

তালাকের পরেও তৃতীয় ঋতুস্নান পর্যন্ত শোহরের বাড়িতে বিবির থাকার অধিকার আছে। নিকাহের সময় যে দেনমোহর ঠিক হয়েছিল সেই দেনমোহর দিয়ে তবেই তালাকশুদা বিবিকে ঘর থেকে বিদায় করা চলে। যে পরিমাণ দেনমোহরের প্রতিশ্রুতি ইয়াকুব দিয়েছিল সেই পরিমাণ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা ইয়াকুবের ছিল না। সে কথা জেনেও জরীনা তাকে নিকাহের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে বলে, ‘‘আমার প্রাপ্য দেনমোহর দিয়ে দাও। তখনই তালাক বলবৎ হবে। তার আগে নয়।”

জরীনাকে না জানিয়েই ইয়াকুব তার মেয়ের পাসপোর্ট বানিয়ে ফেলেছিল। তালাক দেওয়ার পরে তৃতীয় ঋতুস্নানের তিনদিন পরেই ইয়াকুব নিজে থেকেই একটি ব্যাগে মেয়ের ও জরীনার সমস্ত জিনিসপত্র বেঁধে জরীনাকে বাইরে বেরিয়ে যেতে আদেশ দেয়। মুম্বাইয়ের বিমানের টিকিট, কিছু টাকা, জরীনা এবং তার মেয়ের ভারতে যাওয়ার ভিসা এবং জরীনার বাবার নামে একটি মুখবন্ধ খাম সহ বিমানপত্তনে সকন্যা জরীনাকে ছেড়ে দিয়ে আসে ইয়াকুব। জরীনা বিমানে চড়ে মুম্বাইতে এসে নামে।

***

মেয়ে কোলে জরীনাকে দেখে বাড়ির সকলে বিস্মিত। বাড়ির সবার আনন্দের সীমা নেই। পাকিস্তান থেকে কার জন্য কী উপহার এনেছে জরীনা সেটা দেখার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু জরীনার ব্যাগ থেকে কারও জন্য কোনো উপহার না বেরোনোতে সবাই হতাশ। কেন সে বাড়ি এসেছে সেটা বোঝার জন্য সবাই নিজের মতো করে অনুমান করতে থাকে। জরীনা বাবার হাতে মুখবন্ধ খামটি তুলে দেয়। তার সামনেই বাবা খামটি খুলে একটি কাগজ বের করেন। কাগজে অস্পষ্ট অক্ষরে উর্দুতে লেখা চিঠিটির তর্জমা করলে দাঁড়ায়—

‘‘আপনার মেয়ের ছেলে জন্ম দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তার পরেও সে আমার দ্বিতীয় বিবিকে সহ্য করতে পারে না। তাকে তালাক

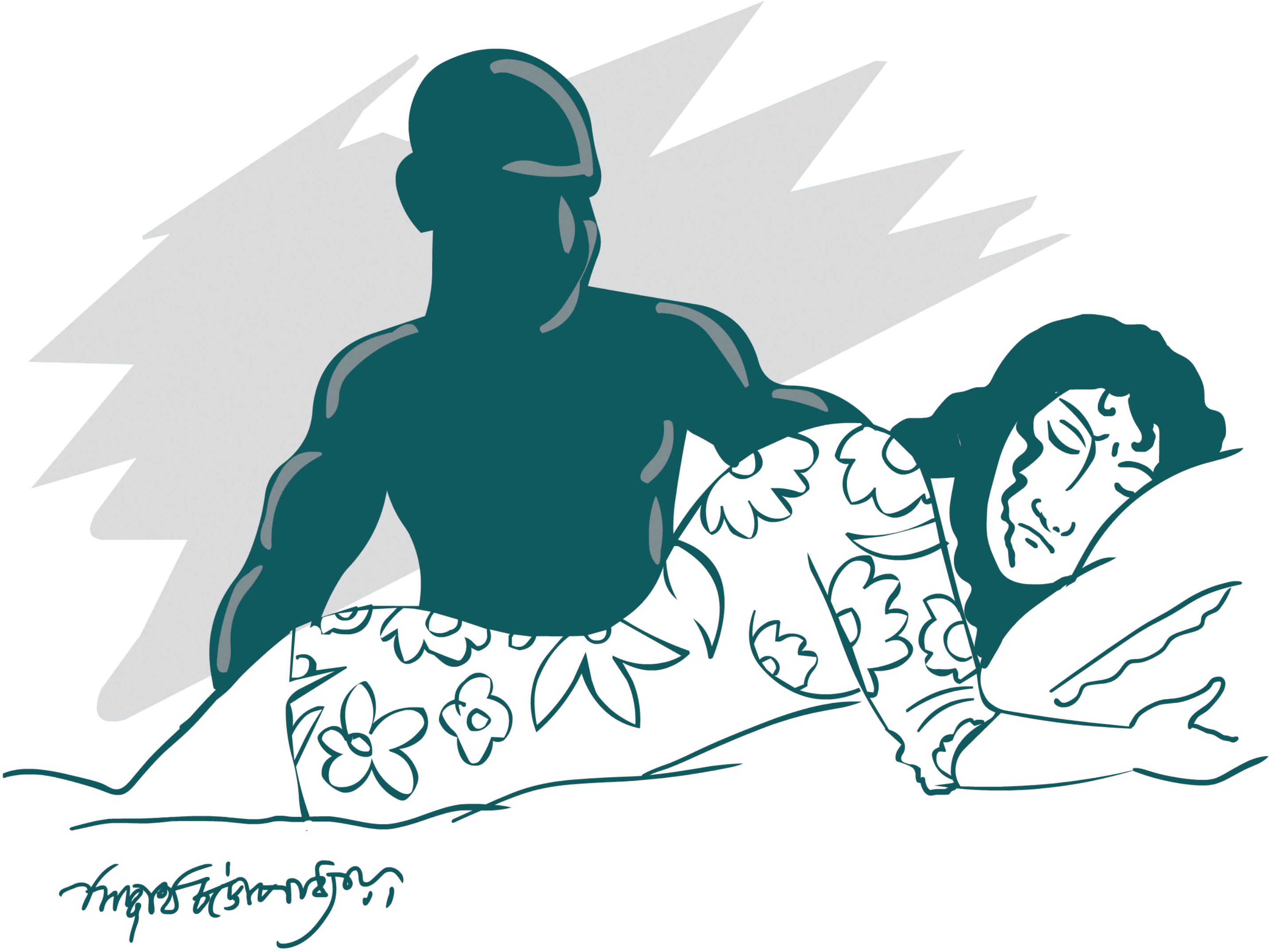

দেওয়ার জন্য আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। এই ধরনের বেয়াদব মেয়ের সঙ্গে সংসার করা আমার মতো মজহবি বান্দার সম্ভব নয়। সেজন্য তাকে পরিত্যাগ করলাম। —ইয়াকুব হুসেন।”

এই কয়েকটি মাত্র পঙ্‌ক্তি চিঠিতে। কোনো সম্বোধন নেই, কোনো শ্রদ্ধা-স্নেহ নিবেদন নেই, কোনো কুশল প্রশ্ন নেই।

বাবা জরীনার দুই গালে দুইটি থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। জরীনাও ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে এল। এই দুইটি থাপ্পড়ে তার জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আরজুকে এই নরকপ্রায় জীবন থেকে বের করতে হবে। মেয়েকে শিক্ষা দিয়ে স্বাধীন করতে হবে—এই তার জীবনের ব্রত হয়ে উঠল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে জরীনা কাছে সরকারি বিদ্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা জানালেন, ‘‘দেখো মা, তোমার মেয়ে জন্মগতভাবে পাকিস্তানের নাগরিক। তাকে এই দেশের নাগরিকতা পেতে হবে। নাহলে পড়াশোনা করেও ও বিশেষ কিছু করতে পারবে না।”

‘‘সেজন্য কী করতে হবে?” জরীনা জিজ্ঞাসা করে।

অধ্যক্ষা জানালেন ‘‘পাকিস্তানের দূতাবাসে গিয়ে পাকিস্তানের পাসপোর্ট জমা দিয়ে ভারতের নাগরিকতার জন্য আবেদন করো। কিন্তু তার পর তুমি চাইলেও আর পাকিস্তানে যেতে পারবে না। যদি আবার তোমার শোহর তোমাকে নিয়ে যেতে চায় তবে তুমি বিপদে পড়বে।”

***

রাত্রিতে মায়ের ঘুপচি ঘরটিতে মায়ের পাশে শুয়ে জরীনা মাকে বলল, ‘‘মা, একটা সত্য কথা বল। ছোট্টবেলা থেকে সব ভাই-বোনেরা নানার ঘরে যায়। কিন্তু তুমি কখনও আমাকে নানার ঘরে নিয়ে যাওনি কেন? আমি যখনই জিজ্ঞাসা করেছি তুমি বলেছ যে, আমার নানার বাড়ির সবাই মারা গেছে। কিন্তু এটা মিথ্যা। সেটা আমি বুঝতে পারি। তুমি মিথ্যা বলতে শেখোনি মা। মিথ্যা বললে তোমার মুখ চোখ পালটে যায়। আজ তোমাকে নানার বাড়ির কথা বলতেই হবে। এই দোজখে এত কষ্ট করে থেকেও তুমি কেন নানার বাড়িতে ফিরে যাওনি মা? আজ তোমাকে বলতেই হবে।”

দীর্ঘ নীরবতার পর ফাতিমা অল্প কথায় নিজের জীবন বৃত্তান্ত শোনায়। ফাতিমা জন্মগতভাবে হিন্দু। ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম। অন্য শহর থেকে এখানে এসেছিল পড়াশোনা করতে। কাছেই একটা মেসে থাকত। জরীনার বাবার দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনত। নিয়তির খেলায় তার প্রেমে পড়ে যায় ফাতিমা। সর্বস্ব পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় এই নরকে এসে ঢোকে। ফাতিমা বলে, ‘‘বাবা-মা সেদিন আমাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কথা আমার কানে ঢোকেনি। সেই দিন প্রেমকেই সর্বস্ব করেছিলাম। আর তাতেই সর্বস্ব খোয়ালাম। তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমি ছিন্ন করেছি নিজে। আজ আর তদের সামনে যাওয়ার সাহস নেই আমার। তারাও আমাকে ভুলে গিয়েছেন।”

***

অনেক কষ্টে জরীনা নানার বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে মায়ের কাছ থেকে। একদিন সন্ধ্যায় আরজুকে কোলে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে জরীনা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সেই ঠিকানায় উপস্থিত হয়।

বাড়িতে এক বৃদ্ধ দম্পতি, এক প্রৌঢ় দম্পতি এবং একটি কিশোরকে দেখতে পায় সে। অনুমান করতে পারে যে এরাই তার নানা-নানি, মামা-মামি এবং মামাতো ভাই। বাড়িতে ঢুকে কোনো গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই বলে ওঠে, ‘‘আমার পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। বেশি কথাও বলে লাভ নেই। কেবল দুটি মেয়ের জীবনের কাহিনি শুনিয়ে আমি এখান থেকে চলে যাব। আপনারা দয়া করে শুনুন।” তার পরে সে ফাতিমার এবং নিজের জীবনের ঘটনা শোনায়। প্রত্যেকের গাল বেয়ে বাঁধভাঙা অশ্রুধারা। পুরো গল্প শেষ করে জরীনা বলে, ‘‘সৎ ছেলেদের দ্বারা প্রতি রাতে ধর্ষিতা সেই মেয়েটি একদিন আপনাদের ঘরের লক্ষ্মী ছিল। সেই লক্ষ্মী আমার গর্ভধারিণী। আর আমার কোলে আমার মেয়ে। এইটুকু শোনাতেই আমি এসেছিলাম। আমি আমার মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করাতে চাই। তাতে যে সমস্যা হচ্ছে তার সমাধানের জন্য আমার পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো আত্মীয়কে আমি চিনি না। কী মনে হতে আপনাদের কাছে এসেছিলাম। এবার আমি উঠি।”

***

দরজার চৌকাঠের বাইরে পা রাখার আগের মুহূর্তে পিছন থেকে কেউ তার হাত টেনে ধরে। পিছন ঘুরে তাকিয়ে জরীনা দেখে তার মামিকে। তিনি বলে ওঠেন, ‘‘তুমি আমার ভাগ্নী। আমি তোমাকে সাহায্য করব। আর এই বাড়িতে তোমারও অধিকার আছে। তোমার, তোমার মেয়ের এবং তোমার মায়ের শান্তির নীড় এই বাড়ি।”

ততক্ষণে পিছন থেকে এগিয়ে এসেছে সবাই। বৃদ্ধ অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলেন, ‘‘আমার মেয়ে যে পাপ করেছে তার শাস্তি সে পেয়েছে। তাকেও নিয়ে এসো তুমি। আজ থেকে তোমরা তিনজনই এই বাড়িতেই থাকবে।” মামা ও দিদিমাও মাথা নেড়ে সায় দিলেন বৃদ্ধের কথায়।

***

জরীনা যথাশীঘ্র মুম্বাই ফিরে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে দোজখের আগুন থেকে বের করে এনেছে। আগে থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করে সেই রাতেই তারা ফিরে এসেছে শান্তিনীড়ে। কয়েকদিন পরে দিল্লিতে পাকিস্তানি দূতাবাসে নিজের এবং কন্যার পাকিস্তানি পাসপোর্ট জমা দিয়ে কিছু কাঠখড় পুড়িয়ে আরজুর ভারতীয় নাগরিকতার আবেদন করেছে। সব কাজ শেষ করে ফিরে এসেছে মামার বাড়ি।

পরেরদিন সকালে সমুদ্রের ধারে যায় জরীনা। ইয়াকুব তাকে দুখানি সোনার রুলি এবং একটি আংটি দিয়েছিল। সেগুলি এতদিনেও সে হাত থেকে খোলেনি। আজ সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সেগুলি হাত থেকে খুলে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হৃদয়ের উপর থেকে শতাব্দীপ্রাচীন পাষাণভার নেমে যায় যেন। বিপুল সমুদ্রের চঞ্চল লহরীর নৃত্য দেখতে দেখতে জরীনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। তার হৃদয় আজ নির্মল, হালকা। হঠাৎ মনে হলো পৃথিবী ঘুরছে, সব অন্ধকার হয়ে আসছে...ঘোর তমিস্রা যেন গ্রাস করছে জরীনাকে। পড়ে যেতে যেতেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে জরীনা। উদীয়মান সূর্যের রক্তিম কিরণে স্নাত জগৎকে দুই চোখ ভরে দেখে। দৃঢ়স্বরে কোলের মেয়ের উদ্দেশে বলে ওঠে— ‘‘আরজু, আজই তোর শেষ দিন। আজ থেকে তুই আর আরজু নোস। তুই আশা। আরজু পাকিস্তানে শেষ হয়ে গিয়েছে। আজ এই বিপুল জলরাশির মধ্যে থেকে উদিত নতুন সূর্যের আলোয় ‘আশা’-র নতুন জন্ম হলো। নতুন আশার কিরণে পৃথিবীকে প্লাবিত কর তুই।” ◘

ফাগুয়ার আগুন

নিখিল চিত্রকর

রাই সাগরে নামল শ্যামরাই

ওই যে মুরলী হাতে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে কালাচাঁদ। পাশে কমল নয়না রাধারানি। ফাগুয়ার রঙে রঙিন যুগল-বিগ্রহ দোলমণ্ডপ আলো করে উপবিষ্ট। তাঁদের ঘিরে মানুষের ভিড়। গুলালে, আবিরে ছয়লাপ। ওই ভিড়ে বিরজা নেই। ওই যে পাশের দুধকুণ্ডে রঙের পরশে মাখামাখি শরীর অবগাহন করে তরুণীর দল খিলখিল করে হেসে জলকেলি করছে, বিরজা সেখানেও নেই। অথচ সুগন্ধা গ্রামের বচ্ছরকার এই দোল উৎসবের দিনে বিরজার থাকার কথা ছিল প্রতিবারের মতোই। দু'গালে আবিরের প্রলেপ, খোঁপায় লাল পলাশ। হারমোনিয়ামের সুরে হিন্দোল তুলে গান গাওয়ার কথা ছিল তাঁর— 'হোরি খেলিছে শ্রীহরি-সহ রাধাপ্যারী/কুঙ্কুম ধুম, শ্যাম অঙ্গভরি/ পুষ্পমালা, হিন্দোল সাজায়ে ব্রজনারী/রাই-শ্যাম অনুপম, দোলে তদুপরি...।' আজও মাইকে গানটা বাজছে। কিন্তু বিরজাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না বটাই। এক আকাশ শূন্যতা বুকে নিয়ে সকাল থেকে বসে আছে ও। গত বছরও এখানে এই সময়ে বিরজা ছিল তার সমস্ত প্রাণময় সত্তা নিয়ে। বসন্তের ছোঁয়ায় রাঙানো তাঁর রূপ যেন— 'অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু/ঝলমল কুন্তল কমল-প্রিয়বন্ধু।।' সেবার দুপুরে মানুষের ভিড় যখন প্রসাদ ঘরের দিকে, বিরজাকে নিয়ে লুকিয়ে মন্দিরের পুকুরপাড়ে চলে এসেছিল বটাই। অগ্নিকোণে, অশোক গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দুটিতে বসে হাজারো স্বপ্ন সাজিয়েছিল সেদিন। তারপর এক সময় বিরজার গোলাপের মতো ঠোঁট দুটিতে এঁকে দিয়েছিল ভালোবাসার চিহ্ন। আর লাল আবিরে সাজিয়ে দিয়েছিল বিরজার সিঁথিপথ। তারপর...। তারপর আর কিছুই ভাবতে পারে না বটাই। কোথা থেকে কালো ধোঁয়ার মতো মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে সব রঙিন পট। তাপের অসহ্য দহন। মেঘেরা গলে যাচ্ছে। বিন্দু বিন্দু অশ্রু, ধারা হয়ে চুঁইয়ে পড়ছে বটাইয়ের চোখ থেকে।

তুমি মোর পাও নাই পরিচয়

বটাই। বটকৃষ্ণ ঘোষ। বটাইয়ের বাবা দোলগোবিন্দ ঘোষ এলাকার হোমরাচোমড়া ব্যক্তি। প্রতিষ্ঠিত আলু ব্যবসায়ী। পোলবার বেতার মোড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সাবেক দালানবাড়ি। জ্ঞাতিগুষ্টি নিয়ে বড়ো পরিবার। গত বছর জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন দোলগোবিন্দ। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আগের তুলনায় আরও বেড়েছে। কান পাতলে শোনা যায়, আসছে বারে বিধায়কের টিকিট একেবারে বাঁধা। এহেন দাপুটে লোকের মাথাব্যথা একমাত্র সন্তান বটাইকে নিয়ে। ছেলেটা গ্র্যাজুয়েশনের পর আর পড়াশোনা করতে চাইল না। দোলগোবিন্দ ভাবলেন মন্দের ভালো।

এবার অন্তত পারিবারিক ব্যবসাটা দেখাশোনা করবে বটাই। কিন্তু সে গুড়েবালি। আলুর ব্যবসায় ইন্টারেস্ট নেই বাবুর। বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপ করে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলেছে। এলাহি ব্যাপার। ঝাঁ চকচকে বড়ো হলঘরের মতো দোতলা দোকানে একই ছাদের তলায় দুনিয়ার জিনিস। আনাজপাতি, দুধ, মুদিখানা, হার্ডওয়ার, হাতা-খুন্তি, খেলার সরঞ্জাম— আরও কত কিছু। লোকে গাড়ি করে জিনিস কিনতে আসে। দিল্লি রোডের ধারে বলে আরও সুবিধে হয়েছে। কয়েক বছরেই 'হাটেবাজারে' ডিপার্টমেন্টাল স্টোর পসার জমিয়ে ফেলেছে। শুরুতে এই ব্যবসায় টাকা ঢালতে ইতস্তত করেছিলেন দোলগোবিন্দ। এখন বুঝতে পারছেন বটাইয়ের এলেম আছে। নিজের রক্ত বলে কথা। এবার ভালো একটা মেয়ে দেখে ছেলের বিয়েটা দিতে পারলেই ঝাড়া হাত-পা হওয়া যাবে। কিন্তু ভাবলেই তো আর হয় না। সাধ আর সাধ্যের সমীকরণ মেলাও যে দরকার। তার বিয়ের জন্য মেয়ের খোঁজ চলছে সে কথা জানতে পেরে মায়ের কাছে সটান হাজির হলো বটাই। সরাসরি জানিয়ে দিল, 'সুগন্ধার গদাই বৈরাগীর বড়ো মেয়েকে আমার পছন্দ। তোমরা প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে রাখতে পারো। বিয়ের এখনো সময় হয়নি।' স্বভাবে বটাই একটু মুখচোরা। কিন্তু ভীষণ একগুঁয়ে। যা ঠিক করবে, সেখান থেকে তাকে টলানো যাবে না। বংশের একমাত্র শিবরাত্রির সলতে। অতএব শুরু হলো তত্ত্ব-তালাশ। পাত্রী সুগন্ধার ন'পাড়ার বিরজা বৈরাগী। এক বোন রুক্মিণী ও

ফঃ ৩

বাবা-মা নিয়ে ছোট্ট পরিবার। জাতিতে বৈষ্ণব। তিন পুরুষের বসতভিটে, চাষের জমি, পুকুরের মাছ সবই আছে। গদাই বৈরাগী কীর্তনের দল চালায়। ইদানীং একটা টিভি চ্যানেলে বিখ্যাত গানের রিয়্যালিটি শোয়ে বিরজার বাবা-মা অনুষ্ঠানের সুযোগ পেয়েছিলেন। এখন হুগলীতে তো বটেই, কলকাতা এমনকী অন্যান্য জেলা থেকেও অনুষ্ঠানের ডাক পাচ্ছেন ওরা। মাসে মাসে টিভি চ্যানেল বাঁধাধরা শো। সুগন্ধার বৈরাগী দম্পতি এখন সেলিব্রিটি। অতএব নামডাকওয়ালা পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে কোনও দোষ দেখেননি দোলগোবিন্দ। দুই পরিবারের মধ্যে কথাবার্তা সারা হয়েছে। কিন্তু বিয়েটা এখনই হচ্ছে না। বিরজার শর্ত, সে স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পাওয়ার পরই বিয়ের পিঁড়িতে বসবে। তাতে বটাইয়ের কোনও সমস্যা নেই। সে অপেক্ষা করতে রাজি।

আসা যাওয়ার পথের ধারে

হাতে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে মহানগরের রাজপথ ধরে হেঁটে চলেছে তরুণ-তরুণীর ভিড়। সামনের সারিতে রয়েছে বিরজা। ওদের মিছিলে স্তব্ধ জনপদ। গন্তব্য শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর। প্রাপ্য চাকরির দাবিতে আজ ওরা রাস্তায় নেমেছে। শিক্ষা দপ্তরের সামনে যেতেই শয়ে শয়ে পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এল। সামনে ব্যারিকেড। জলকামান। অনেকের হাতে কাঁদানে গ্যাসের বন্দুক। মাইকে ভেসে আসছে পুলিশের সতর্ক ঘোষণা। তরুণ রক্ত কি দুর্নীতির সামনে মাথা নোয়াবে আজ? না। ওরা ব্যরিকেড ভেঙে ঢুকে পড়তে চাইল। এবার শুরু হলো তাণ্ডব। লাঠি চার্জ। এলোপাথাড়ি কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুটে এলো মিছিল লক্ষ্য করে। ধোঁয়ায় ভরে উঠল চারদিক। কয়েকজন লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আর্ত চিৎকার। বিরজার মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। সে পড়ে যাচ্ছে। এমন সময় কেউ তাকে হ্যাঁচকা টান মেরে ছত্রভঙ্গ মিছিল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। আবছা চোখে বিরজা দেখল, সে বটাই।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে বিরজা। মাথায় বাঁধা ব্যান্ডেজ। সে উঠে বসতে গেলে পাশ থেকে বটাই বলল—

—শুয়ে থাকো। তুমি জ্ঞান হারিয়েছিল বিজু। মাথায় গভীর আঘাত। অনেক চেষ্টায় ব্লিডিং বন্ধ করা হয়েছে। মাথার স্ক্যান হয়েছে। রিপোর্টে সব ঠিকঠাক থাকলে তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব। আর হ্যাঁ তোমার বাবা-মাকে আমি জানিয়েছি। তাঁরা আসছেন। সঙ্গে রুক্মিণীও।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বটাইয়ের দিকে তাকালো বিরজা, দুর্বলস্বরে প্রশ্ন করল।

—তুমি কি মিছিলের মধ্যেই ছিলে? অথচ আমার সঙ্গে একবারও দেখা করলে না কেন?

—কাল রাতে ফোনে কথা বলার সময় যখন তুমি মিছিলের কথা জানালে, তখন থেকেই মনটা ছটফট করছিল। তাই চলে এলাম। জানো, ছোটোবেলায় আমাদের পাড়ার এক দাদা এরকম একটা মিছিলে প্রাণ হারিয়েছিল। সুজয়দা তখন প্রেসিডেন্সিতে পড়ে। ছাত্রনেতা হিসেবে খুব পরিচিত মুখ। সুজয়দার মৃত্যুর দায় কেউ নেয়নি সেদিন। কারও শাস্তি হয়নি। ওঁর বৃদ্ধ বাবা-মা আজও ছেলের স্মৃতি বুকে আঁকড়ে বিষণ্ন দিন কাটাচ্ছে। আজ আমি যদি ঠিক সময়ে তোমাকে ভিড় থেকে সরিয়ে নিয়ে না আসতাম, কী হতো জানি না বিজু! তোমার বাবা-মা, রুক্মিণী, আমি, আমরা সবাই তোমাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তায় থাকি। আমার ব্যবসা-ট্যাবসা সব লাটে উঠেছে। শুধু তোমার এইসব খামখেয়ালিপনার জন্য।

—আমাকে নিয়ে এত ভেবো না। তোমরা সবাই আমাকে নিয়ে খুব বিরক্ত। বাবা-মা সেকথা আমার মুখের ওপরেই বলেছে। তোমাকেও বলছি, আমার জন্য সময় নষ্ট করছ বটাই। আমি আগেও বলেছি এটা আমার কাছে একটা লড়াই। এই লড়াইয়ের শেষ দেখে ছাড়ব আমি। আমার কথা না হয় বাদ দিলাম। আমি অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মেছি। তোমার মতো ভালোবাসার মানুষ পেয়েছি। জানি বিয়ের পর আমার কোনও কিছুর অভাব থাকবে না। হয়তো চাকরি করারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু বটাই, যে ছেলে-মেয়েগুলোর কিছু নেই, তাদের কী অবস্থা বলো তো?

—আমি তাদের কথা বলতে পারব না। আমি তোমাকে নিয়ে ভাবছি বিজু।

—কতজন চাষের জমি বিক্রি করে দিয়েছে বিএড পড়ার জন্য। এদের মধ্যে অনেকের বাবা দিনমজুরি করে, কেউ রিকশা চালায়। কেউ অফিসের কেরানি। এরা প্রত্যেকে যোগ্য। অথচ এদের নাম মেরিট লিস্টে থাকা সত্ত্বেও অযোগ্যরা চাকরি পেয়ে গেল! আমাদের ন্যায্য চাকরি, আমাদের অধিকারের চাকরি ক্ষমতায় থাকা নেতা-মন্ত্রীরা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে। আর তুমি আমাকে চুপ করে থাকতে বলছো বটাই? বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তোমাদের, আমাদের বঞ্চিত করে সেই চাকরি কাদের বিক্রি করা হয়েছে? ক্লাস নাইনে দু'বার ফেল করেছিল অনিমেষ বেরা, সে আজ স্কুলের শিক্ষক। একই পরিবারের সাতজন প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পেয়েছে। কী করে? তুমিও জানো তারা কারা। এদের কাছেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একদিন পড়তে যাবে। তুমি ভাবতে পারছো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কী হাল?

উত্তেজিত হয়ে পড়লো বিরজা। তার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে শান্ত করল বটাই। বলল–

—সবই জানি। কিন্তু সবকিছু রাতারাতি বদলে ফেলার আমরাই-বা কে? তুমি শান্ত থাকো। এত উত্তেজনা এই সময়ে ঠিক না। সবকিছু ভালো হবে। তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

—বলো

বাকি কথাগুলো বটাই আর বলতে পারলো না। হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এল ছেলে-মেয়ের দল। তার সঙ্গে টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক। ক্যামেরার ঝলকানি আর ডজন খানেক বুমের আড়ালে ঢাকা পড়ল বিরজার মুখ।

দোলগোবিন্দ ভেবেছিলেন ছেলের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। বিয়ের তো কোনও নামগন্ধই নেই উলটে তার হবু বউমা এখন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটার বিপ্লবী ও বেপরোয়া ভাবমূর্তি ভবিষ্যতেও যে দোলগোবিন্দকে বিপদে ফেলবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না বিরজাকে। কাল থেকে সারাদিন টিভি চ্যানেলে

মিছিলের মধ্যে বিরজার আহত হওয়ার খবর দেখাচ্ছে। সেসব দেখে গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে দোলগোবিন্দর। কিছুদিন আগেই জেলা সভাপতি অরূপ ঘোড়ুই পার্টি অফিসে ডেকে যাচ্ছেতাই অপমান করল। শুধু তাই না, হবু বউমার বাড়াবাড়ি বন্ধ না হলে আদতে দোলগোবিন্দরই ক্ষতি হবে সেই হুমকিও দিয়েছে। তারপর থেকে যেন মাথায় আগুন জ্বলছে। বটাইও বিরজার পড়ানো বুলি আওড়াচ্ছে। বিরজা যদি ওসব আন্দোলন বন্ধ করে দেয় তাহলে ওপরমহলে কথা বলে ওর চাকরিটা করে দেবে, এমন টোপ দিয়েছিল, তা ধোপে টেকেনি। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে জানেন না দোলগোবিন্দ। কলকাতা থেকে ফিরলে আরেকবার বটাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সদর দরজার বাইরে ইন্দু বোষ্টুমি খঞ্জনি বাজিয়ে হরিনাম গাইছে। বৈঠকখানা ঘরের চেয়ারে বসে ব্যাংকের পাস বইয়ে চোখ বোলাচ্ছিলেন দোলগোবিন্দ। বটাইকে ডেকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন, 'দুনিয়ায় আর কোনও মেয়ে পেলে না। খুঁজেখুঁজে ওই বৈরাগীর মেয়েকেই পছন্দ হলো। ওই মেয়ের কী সাহস? টিভি চ্যানেলে আমাদের পার্টির নেতা-মন্ত্রীদের দিকে আঙুল তুলে কথা বলছে। নেহাত আমার সঙ্গে আত্মীয়তা হচ্ছে বলে, নইলে কোথায় গুম হয়ে যেত কাকপক্ষীও টের পেত না। কিন্তু এসব বেশিদিন চলতে পারে না। ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে আমায় কিছু বলতে এসো না। এখনও সময় আছে। তুমি কি ওর সঙ্গে কথা বলেছো?

—হ্যাঁ, বলেছি। বিজু জানিয়ে দিয়েছে ও নিজের সিদ্ধান্ত থেকে এক পাও পিছোবে না —বটাই বলল।

– বেশ, তাহলে তুমি ওই মেয়েকে ভুলে যাও। খাল কেটে কুমির আনতে পারব না। আমি অন্যত্র তোমার সম্বন্ধ দেখছি। এই সমস্ত অশান্তিতে জড়িয়ে তুমি নিজের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করো না' বাবার কথার মাঝেই বেশ দৃঢ়স্বরে বটাই বলল, 'বিজু নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলছে, এতে ভুল কিছু দেখছি না। জানি, তুমি নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে। তেমন হলে আমায় ত্যাজ্য করে দিতে পারো। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।' মুখের ওপর কথাগুলো বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বটাই। দোলগোবিন্দ রাগে গজগজ করতে করতে টেবিলে পড়ে থাকা ছাইদানিটা ছুঁড়ে মারলেন দেওয়ালে।

অধরা মাধুরী

বটাইয়ের বয়স তিরিশ ছুঁইছুঁই। চিরকালই সে একটু অন্তর্মুখী স্বভাবের। বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে কারও সঙ্গে ভাব জমানো বা মেলামেশা করা তার ধাতে নেই। ছেলের এমন স্বভাব নিয়ে খুব চিন্তায় থাকতেন সুলতা। ছোটো থেকেই মা-ন্যাওটা। সমস্ত গোপন কথা মায়ের

সঙ্গেই। অবসরে গান শোনা তার সখ। এই গানই বিরজার কাছাকাছি এনেছিল বটাইকে। তখন একাদশ শ্রেণী। স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানের গান গাইছিল বিরজা-- 'বসন্ত আওল রে/মধুকর গুনগুন, অমুয়ামঞ্জরী/কানন ছাওল রে।' সেদিন ভানুসিংহের পদাবলীর মধুর ছন্দ বটাইয়ের মনে প্রেমের জোয়ার এনেছিল। কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী বিরজাকে মনের কথা বলতে পারেনি বটাই। উচ্চ মাধ্যমিকের পর চন্দননগর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হলো বিরজা। বটাই খলিসানি কলেজে। বছর দুই পর একদিন চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে দুজনের দেখা। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। বিরজা মাস্টার্স পড়তে কলকাতার প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হলো। বটাই ব্যবসা শুরু করল নিজের পায়ে দাঁড়াতে। তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ালো বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে। বিরজা বিএড করলো। স্কুল সার্ভিস পরীক্ষা দিল। মেধা তালিকায় তার নাম উঠল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ইন্টারভিউর কল পেল না। শয়ে শয়ে ছেলে-মেয়ে চাকরি থেকে বঞ্চিত। বিরজারা আন্দোলনে নামলো। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিল বিরজা। আর ক্রমশ শাসকদলে চক্ষুশূল হয়ে উঠলো। ভয় পাওয়া তার ধাতে নেই। বিরজার মন যেমন নরম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার প্রকৃতি ততই কঠিন। আরেক বিরজা ছিলেন গোলোকধামে। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণলীলার এক পর্বে রাধার অজ্ঞাতসারে গোপিনী বিরজার সঙ্গে ভাব-প্রেমে রত ছিলেন কানাই। রাধার কানে সে খবর পৌঁছোতেই সেখানে হাজির হলেন। রাধার আগমন ঠাহর করে কানাই সেখান থেকে আগেই সরে পড়েন। কানাইকে না পেয়ে রাধারানির সব রাগ গিয়ে পড়ল সখী বিরজার ওপর। অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে যোগবলে

সেখানেই নিজের প্রাণত্যাগ করেন বিরজা। একদিন নিজের নামকরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বটাইকে এই কাহিনি শুনিয়েছিল বিরজা। মাঝে মাঝে বটাইয়ের ভয় হয়। বিরজা বড্ডো আবেগপ্রবণ মেয়ে। কখন কী করে বসে ঠিক নেই। তাই সব সময় ওকে আগলে রাখতে চায়। প্রথমে ওদের আন্দোলনের কর্মসূচি বিক্ষোভ, মিছিলেই সীমিত ছিল। এখন আবার ধরনায় বসেছে।

নেই। বটাই চাঁদের ক্ষীণ আলোয় দেখল বিরজার দুচোখে চিকচিক করছে জল।

—তুমি কাঁদছো বিজু?

বিরজা উত্তর দেয় না। বটাই তার চোখের জল মুছে দেয় নিঃশব্দে। কখনো কখনো নীরবতাও অনেক কথা বলে যায়। সে বিরজার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ওর কাঁধে মাথা রাখে বিরজা। একসময় কথা বলল ওরা। অনেকদিনের জমানো কথা

ধর্মতলায় মাতঙ্গিনী মূর্তির নীচে ওদের ধরনামঞ্চ। সামনে দোল। বিজু কথা দিয়েছে আগামী সপ্তায় বাড়ি আসবে। অনেকদিন পর একান্তে দেখা হবে দুজনের। কত কথা বলার আছে...।

সেদিন সন্ধ্যায় কালাচাঁদ জিউর মন্দিরে দেখা করলো ওরা দুজনে। কালাচাঁদকে দর্শন করে পুকুর সংলগ্ন চাতালে গিয়ে বসল। আকাশে বাঁকা চাঁদ। গা শিরশির করা বাতাসে ভেসে আসছে কাঠগোলাপের মিষ্টি সুবাস। বটাইয়ের হাত ধরে গুন গুন করে গাইছে বিরজা—

‘তুমি কিছু নিয়ে যাও, বেদনা হতে বেদনে/যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যে বাণী নীরব নয়নে’— রবি ঠাকুরের গান। তারপর অনেকক্ষণ কারও মুখে কোনও কথা

মনের অলিন্দ ছেড়ে উড়ান দিল। তারপর মন্দির বন্ধ হওয়ার পর দিল্লি রোডের ধারে একটা কফিশপে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দুজনে বাড়ির পথ ধরে। বটাই চেয়েছিল বিরজাকে একেবারে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরবে। বিরজা বলল, ‘দরকার নেই। স্কুটি আছে। অসুবিধে হবে না আমার। তুমি এগোও। অনেকটা পথ যেতে হবে তোমার। ফিরে জানিও। অপেক্ষা করে থাকবো।’ বাইকে চাবি গলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বটাই। যতক্ষণ না মেন রোড থেকে বিরজার স্কুটিটা বাঁদিকের গ্রামে ঢোকার ছোটো রাস্তায় ঢুকছে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে সে। বিরজার স্কুটি স্টার্ট নিল। কিছুটা এগিয়ে হাত দেখালো বটাইকে। বটাইও হাত নাড়ল। বিরজার স্কুটিটা খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে। এই সময়ে রাস্তায় গাড়িঘোড়া কম থাকে। ঠিক তখনই বটাইকে পাশ কাটিয়ে একটা লরি ঝড়ের গতিতে গিয়ে পেছন থেকে বিরজাকে ধাক্কা মারল। স্কুটিটা ছিটকে গিয়ে পড়লো পাশের ঝোপে। আর ট্রাকের চাকায় পিষে যাওয়া বিরজার রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে রইল রাস্তায়।

ঝরা ফুলের গন্ধ

অশোক গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দুধ কুণ্ডের জলের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে বটাই। আবির ধোয়া জলে বারবার ভেসে উঠছে তার মুখ। ‘চন্দন আঁকা ছোট্ট কপাল/মাঝখানে টিপ কুমকুম লাল’— শেষযাত্রায় এভাবেই তো সেজেছিল বিরজা। বিরজার সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেল বটাইয়ের। তার সমস্ত জগৎ উজাড় করে না-ফেরার দেশে চলে গেছে তার বিজু। পড়ে আছে খই পোড়ানো ছাইয়ের মতো স্মৃতি। এই ক'দিন অনেক কিছু ঘটে গেছে বিরজার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। খবরের কাগজে, টিভি চ্যানেলে শিরোনাম— আকস্মিক মৃত্যু না পরিকল্পিত খুন? অনেকেই নামলো ঘোলা জলে মাছ ধরতে। এমনকী তার বাবাও। সেদিন অভিশপ্ত অকুস্থলে দৌড়ে গিয়ে বটাই দেখেছিল বিরজার রক্তে মাখা দেহটা তখনও থরথর করে কাঁপছে। দুমড়ে মুচড়ে গেছে শরীর, কিন্তু মুখটায় কোনও বিকৃতি নেই। বটাই এখনও বাকরুদ্ধ। দোলগোবিন্দ ঘোষকে এ জীবনে আর ক্ষমা করতে পারবে না বটাই। তার ধারণা সবকিছুর পেছনে তার বাবার হাত আছে। এ জীবনের সমস্ত সাধ-সাধ্য-সাধনা নদীর জলে ভেসে গেছে বটাইয়ের। সে নদীর নাম বিরজা। গোলোকধামের গোপিনী বিরজা প্রাণত্যাগ করার পর তাঁর দেহ নদীতে পরিণত হয়েছিল। সেই নদীতে সম্পূর্ণ গোলোকধাম আচ্ছন্ন হয়েছিল। আজ দোলপূর্ণিমা। রঙের বাহারে ব্যাপ্ত প্রকৃতি আজ বসন্ত রাগের সুরে মগন। কালাচাঁদের বদনময় আবিরে রঙিন অথচ নিঃসীম অন্ধকার বটাইয়ের মনে। তার সমস্ত আবেগ, সমস্ত আবেশ, সমস্ত অন্তর্জগৎ লীন হয়েছে স্নিগ্ধ নদীটিতে। যার নাম বিরজা। ■

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রা

গোপাল চক্রবর্তী

নীলাচলে মহাপ্রভুকে নিয়ে ভক্তরা মহানন্দে আছেন। পুরীর মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত। মহাপ্রভুর অদর্শনে তিনিও অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। এই সময়ে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার কথা মনস্থ করেন। সন্ন্যাসের পর একবার জন্মভূমি দর্শন করতে হয় এমন নিয়ম আছে। তাই স্থির করলেন জননী-জন্মভূমি ও গঙ্গা দর্শন করে ওই পথে বৃন্দাবন যাবেন। প্রথমে তিনি সার্বভৌম ও রামানন্দকে এই কথা বললেন। তাঁরা স্তম্ভিত হলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র এই সংবাদশুনে বড়ো ব্যথিত হলেন। তিনি সার্বভৌম ও রামানন্দের উপর দায়িত্ব দেন যেভাবেই হোক মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রা ঠেকাতে হবে। মহাপ্রভুহীন এই রাজ্য, ভোগৈশ্বর্য, সব তাঁর কাছে মরুভূমি সম। এরপর যখন মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রার কথা তুলেন, তখন এঁরা দুইজন বলেন আগে রথযাত্রা দর্শন করে কার্তিক মাসে যাত্রা করুন। কার্তিক এলে বলেন এখন প্রচণ্ড শীত, দোলযাত্রা দেখে যাওয়াই ভালো। আজ কাল করে বিচ্ছেদের ভয়ে তাঁরা কিছুতেই যাওয়ার সম্মতি দেন না।

এই ভাবে দু' বছর অতীত হলো। ওদিকে নবদ্বীপ এবং অন্যান্য অঞ্চলের ভক্তরাও প্রভুর দীর্ঘ অদর্শনে ব্যাকুল। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের উপর যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা তিনি যথাযথ পালন করেছেন। এবার নিত্যানন্দ-সহ প্রধান প্রধান ভক্তরা সস্ত্রীক প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলে উপস্থিত। কে নেই সেখানে! আচার্য অদ্বৈত, শ্রীবাস, বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দ, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীরঘুনন্দন, শিবানন্দ সেন। আছেন শচীমাতার সেবক দামোদর। তাঁদের নীলাচলে আসা মোটেও সহজ হয়নি। ওড়িশা সীমান্তে তখন হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ চলছে। তাঁরা অনেক নিরাপদ ঘুরপথে মহাপ্রভুকে স্মরণ করতে করতে নীলাচলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মহাপ্রভুকে দেখে তাঁরা আনন্দের প্লাবনে ভাসলেন। প্রিয় ভক্তদের দেখে মহাপ্রভুও প্রীত হলেন। শচীদেবীর সেবক দামোদরকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—দামোদর, জননীর শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি আছে তো?

প্রভুর সান্নিধ্যে কতিপয় দিবস সস্ত্রীক ভক্তরা মহানন্দে অতিবাহিত করলেন। একদিন প্রভু সবাইকে ডেকে বললেন—

—এবার তোমরা বেশিদিন এখানে থেকো না। রথ দেখে ফিরে যেও। আমি বিজয়া দশমীর দিন শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করবো। যাওয়ার পথে গৌড়ে মা-গঙ্গা ও জন্মদাত্রী মা-কে দর্শন করে যাব।

প্রভু দেশে যাবেন, জননীকে দর্শন করবেন শুনে ভক্তরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠলেন। তাঁদের ইচ্ছা তাঁরা প্রভুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। প্রভু সম্মত হলেন না। রথযাত্রার পর ভক্তরা গৌড়ে ফিরে যাবেন এটাই স্থির হলো। এই সময়ে শ্রীঅদ্বৈত সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি কৃষ্ণকীর্তনের মতো গৌরকীর্তন প্রচার করবেন। এবং তা প্রকাশ্যে প্রভুকে শুনিয়ে করতে হবে। কিন্তু ভয় প্রভু তাঁর গুণকীর্তন সহ্য করতে পারেন না। একবার এক ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁকে ভগবান বলে সম্বোধন করেছিলেন বলে প্রভু

ক্লেশে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন, আর দু'দিন অনবরত ক্রন্দন করেছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত অনেক বিবেচনা করে একটি পদ রচনা করলেন—

'শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর।।'

এই পদটিতে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান, তা স্পষ্ট না বলে তাঁকে শুধু নারায়ণ বলা হয়েছে। নারায়ণ সন্ন্যাসীমাত্রকেই বলা যায়। তাঁকে নারায়ণ বললে তিনি আপত্তি করতে পারেন না। কারণ সন্ন্যাসীকে 'নমো নারায়ণ' বলে অভ্যর্থনা করতে হয়।

তখন কয়েকশো ভক্ত খোল-করতাল নিয়ে নব-অবতারের কীর্তন আরম্ভ করলেন। ক্রমে তাঁরা স্পষ্ট করে গাওয়া শুরু করলেন— 'হে হরি; তুমি যে গোলোক ত্যাগ করিয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এখন 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নামধারী হইয়া বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার।' কীর্তন করতে করতে ভক্তরা উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। সেই কীর্তনধ্বনি যেন জগদ্ব্যাপী উঠল। প্রভু তখন কাশী মিশ্রের বাড়িতে বসে এই কীর্তন শুনলেন। কীর্তনে যোগদানের জন্য তিনি হৃষ্টচিত্তে বেরিয়ে এলেন। ভক্তদের ভয় তখন আর নেই। তাঁরা প্রভুকে দেখে আরও উদ্বেল হয়ে উঠলেন। প্রভুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তারা বলতে লাগলেন— 'তুমি কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার! তুমি কৃষ্ণ, তোমার জয় হোক।' প্রভু প্রথমে ভেবেছিলেন এরা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন করছেন। পরে সম্যক উপলব্ধি করে— লজ্জায় তাঁর চন্দ্রবদন মলিন হয়ে গেল। অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে গেলেন। ভক্তরা ভীত হলো, কীর্তন থেমে গেল। সবাই তখন ভয়ে ভয়ে প্রভুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। সেবকের মাধ্যমে প্রভুর অনুমতি নিয়ে তাঁরা প্রভুর শয্যার পাশে গিয়ে বসলেন। প্রথমে অদ্বৈত আচার্য, তার পরে শ্রীবাস পণ্ডিত, তারপরে অন্য সবাই। এই কীর্তি যে অদ্বৈত আচার্যের প্রভু তা সহজেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই তাঁকে উপেক্ষা করে শ্রীবাস পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পরিবর্তে চৈতন্যের কীর্তন করছেন? আরও বললেন এতে বর্তমানে লোকে উপহাস করবে এবং পরকালে সর্বনাশ হবে। শ্রীবাস করজোড়ে বললেন—

—প্রভু আমি জীবের স্বাধীনতা স্বীকার করি না। তুমি প্রভু, আমরা অধীন। তুমি যেমন বলাইলে আমরা তেমন বলিলাম।

শ্রীবাসের এই কথায় প্রভু আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

—কর্ম করলে তোমরা আর অপরাধী হলাম আমি?

ঠিক এই সময়ে ভবনের সম্মুখে অসংখ্য লোক সমবেত হয়ে— 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলে গৌরকীর্তন আরম্ভ করলেন। কেউ বলে— 'জয় সচল জগন্নাথ। কেউ বলে 'জয় সন্ন্যাসীরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ'। এরা সবাই গৌড়বাসী। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে এসেছেন। প্রভুর দর্শন লালসায় এই ভবনের দ্বারে এসে প্রভুর নামকীর্তন করছেন। তখন শ্রীবাস বললেন—

—প্রভু, আমরা তোমার দাস। তুমি যা বলবে তা আমাদের করতেই হবে। কিন্তু এখন কীকরে এদের মুখ বন্ধ করবে? এই যে সহস্র সহস্র ভক্ত, যাঁরা তোমাকে কৃষ্ণ বলে পূজা করছেন, এঁরা হয়তো তোমাকে কোনোকালে দেখেননি। এঁরা একথা কেন বলেন যে তুমি ভগবান? তুমি যাই ভাবো আমরা এঁদের শিখিয়ে দিইনি। প্রভু, তোমার নির্মল যশ জগৎ পরিব্যাপ্ত। তা রোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর ইচ্ছাও নেই। তোমার শ্রীচরণ-কৃপাবলে সমুদয় জগৎ উদ্ধার হয়ে গেল। প্রভু, লোকে কী সাধে তোমার পূজা করে?

এইসব কথা বলতে বলতে শ্রীবাসের ও অন্য সকলের অশ্রুপাত হতে লাগল। প্রভু তখন নীরব হলেন। নরোত্তম ঠাকুর বলছেন—

'শ্রীগৌরাঙ্গের রাঙ্গাপদ, যার ধন সম্পদ সে জানে ভকতিরসসার।
শ্রীগৌরাঙ্গের মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা, নির্মল হৃদয় ভেল তাঁর।।'

এর কিছুদিন পরে গৌড়ীয় ভক্তরা প্রভুর নির্দেশে দেশে ফিরে গেলেন। প্রভু তাদের বললেন বিজয়া দশমীর দিন তিনি যাত্রা করবেন এবং জাহ্নবী ও জননীকে দর্শন করে বৃন্দাবন যাবেন।

* * *

ক্রমে বিজয়া দশমী আসছে আর রামানন্দের প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে। সার্বভৌমের এই দশা, রাজারও এই দশা। প্রভুর যে সব পার্ষদ মন্দিরের সেবা কার্যে যুক্ত তাঁরা প্রভুর সঙ্গী হতে পারবেন না। প্রভুর সঙ্গী হবেন পুরী, ভারতী এবং তাঁর আশ্রিত অন্যান্য সন্ন্যাসীরা। স্বরূপও অবশ্য চললেন। প্রভু যখন লীলাচল ত্যাগ করে চললেন, তখন সেখানে হাহাকার পড়ে গেল। নীলাচলবাসীরা

প্রভুর সঙ্গী হলেন। কেউ চিৎকার করছেন, কেউ রোদন করছেন, কেউ-বা হতবাক্। আর মহাপ্রভু, স্নানযাত্রার সময় পাঁচদিন শ্রীশ্রী জগন্নাথ অদর্শন থাকেন, মন্দিরের কপাট খোলা হয় না। সেই কারণে জগন্নাথ বিরহে প্রভু প্রতি বছর মৃতপ্রায় হতেন। সেই প্রভু এখন কীভাবে জগন্নাথকে ত্যাগ করে আনন্দে কীর্তন করতে করতে চললেন? কারণ প্রভু এখন আপন হৃদয় পদ্মাসনে শ্রীনীলাচল চন্দ্রের স্থানে শ্রীবৃন্দাবনকে স্থাপিত করলেন। কাজেই এখন শ্রীজগন্নাথকে ভুললেন এবং শ্রীবৃন্দাবন বলে নৃত্য করতে করতে চললেন।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবেন এই ভাবতে ভাবতে প্রভু যাচ্ছেন। এই সময়ে একটি সুন্দর বৃক্ষ দেখে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হলো। প্রভু দেখছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃক্ষের একটি ডালে বসে প্রভুর দিকে চেয়ে আছেন এবং ইশারায় তাঁকে ডাকছেন। শ্রীকৃষ্ণকে ধরার জন্য প্রভু সেই বৃক্ষে আরোহণ করতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। ডাল ধরে ঝুলতে লাগলেন। এদিকে রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ যেন রাধারূপ প্রভুর সঙ্গে লীলা করার জন্য সেই বৃক্ষ ত্যাগ করে অন্য বৃক্ষে আশ্রয় করলেন। প্রভুও সেই বৃক্ষ ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বৃক্ষের দিকে ছুটলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ একবৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করছেন, প্রভুও তাঁকে ধরবার জন্য পশ্চাদ্‌ধাবন করছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে বৃক্ষ অবলম্বন করেছিলেন প্রভু প্রেমবশে সেই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করছেন। কখনো শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত কোনো বৃক্ষকে চুম্বন করছেন। কণ্টাকাকীর্ণ বৃক্ষে আলিঙ্গন ও চুম্বনের ফলে তার কোমল শরীর আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে। কোনো বৃক্ষের সঙ্গে প্রভু যেন একান্তে মনের কথা বলছেন।

ভক্তরা দেখলেন প্রভুর বাহ্যদৃষ্টি নেই, একবারে দেবচক্ষু। সর্বাঙ্গ পুলকে কণ্টকিত। প্রভু ভক্তদের বলছেন—

—দেখ দেখ, কৃষ্ণচন্দ্র ইতস্তত প্রত্যেক বৃক্ষে বিরাজ করছেন। আমি জগৎ কৃষ্ণময় দেখছি।

এভাবে লীলা করতে করতে প্রভু ভক্তজন-সহ অগ্রসর হচ্ছেন। প্রভুর নিকট থেকে রাজা প্রতাপরুদ্র বিদায় নেওয়ার পর; রাজকর্মচারী ও সৈন্যরা সকলে প্রভুর চরণে প্রণাম করলেন। রাজা বাইরে এসে প্রভুর নির্বিঘ্ন যাত্রার জন্য দু'জন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীকে প্রভুর সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রভু যেখানে অবস্থান করবেন সেখানে তাঁর এবং সহযাত্রী ভক্তদের আহার্য ও অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ সেই কর্মচারীদের দেওয়া হলো। প্রভুর সঙ্গে পুরী, ভারতী, স্বরূপ প্রভৃতি সন্ন্যাসী আর হরিদাস, জগদানন্দ, মুকুন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর, গোপীনাথ, মন্দাই প্রভৃতি ভক্তরাও চললেন। ক্রমে সকলে ওড়িশা রাজ্যের সীমানায় এসে উপস্থিত হলেন। ওপারে মুসলমান ঘাট রক্ষক, অতি নিষ্ঠুর ও ভয়ানক ব্যক্তি।

ওড়িশার স্থানীয় অধিকারী প্রভুর চরণে এসে প্রণাম করে জানালেন, এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আর অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না। ওপারের মুসলমান অধিকারীর সঙ্গে সন্ধি করে প্রভুকে ভক্তজন-সহ ওপারে পাঠানো হবে। প্রভু এই প্রস্তাব শুনে কোনো মন্তব্য করলেন না। এদিকে প্রভুর আগমন সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে লক্ষ লক্ষ জনসমাবেশ ঘটল। লক্ষ কণ্ঠে 'হরিধ্বনি' উঠল। এই গগনবিদারী ধ্বনি ওপারের অধিকারীর কর্ণগোচর হলে সে ভাবল হিন্দুদের বহুতর নতুন সৈন্য এসেছে। প্রকৃত সংবাদ জানার জন্য মুসলমান অধিকারী এক গুপ্তচর পাঠিয়ে দিল। গুপ্তচরটি হিন্দুর বেশ ধরে এপারে এসেছিল। এসে যা দেখল তাতে সে অভিভূত হয়ে গেল। সে দেখে চারদিকে নৃত্য, হরিধ্বনি, চারদিকে ভক্তির তরঙ্গ। নিজের ধর্ম, স্থান, কাল, পাত্র ভুলে আবেগে আপ্লুত হয়ে সেও 'হরিধ্বনি' করতে লাগল।

সেই ভক্তির তরঙ্গে অনেকক্ষণ হাবুডুবু খেয়ে সেই মুসলমান গুপ্তচর প্রভুর কাছে এসে উপস্থিত হলো। তার তখন পুনর্জন্ম হয়েছে। সে বাহু তুলে 'হরিবোল' বলে নৃত্য করতে লাগল। প্রভুর দর্শন লাভ করে সে সম্পূর্ণ নতুন মানুষে পরিণত হলো। এই অবস্থায় সে মুসলমান অধিকারীর নিকট ফিরে এল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এমন এক অপৌরুষেয় শক্তি ছিল যে কখন তাঁর দর্শনে, কখন তাঁর স্পর্শনে, কখনো-বা তাঁর কথা শুনে জীব অবিভূত হয়ে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বা হরি হরি বলত আর নৃত্য করত। প্রভু এই মুসলমান ভক্ত দ্বারা মুসলমান অধিকারীর কাছে সেই শক্তি পাঠালেন। মুসলমান চরের নৃত্য দেখে ও তার মুখে কৃষ্ণনাম শুনে অধিকারীও বিহ্বল হয়ে পড়ল। চর বলল, 'যাকে দেখে এলাম, তিনি মনুষ্য নন। তিনি সেই 'তিনি' যিনি হিন্দু মুসলমান সবাইকেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর গাত্রবর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, রূপ অমানুষিক, নতুন যৌবন ও প্রকাণ্ড দেহ। আর পদ্ম-চক্ষু দিয়ে অনবরত প্রেমধারা বাইছে। তাঁকে দর্শন করলে যে আনন্দ হয়, তা শত সহস্র বাদশাহি থেকেও শ্রেষ্ঠ। ভাট মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ শুনে শ্রীমতী রাধারানি যেরূপ উন্মাদগ্রস্তা হয়েছিলেন মুসলমান অধিকারীরও সেই দশা হলো। তখন সে কীরূপে প্রভুকে দর্শন করবে সেই ভাবনায় অস্থির। এই সময়ে সন্ধির প্রস্তাব এল ওড়িশার পক্ষ থেকে। অধিকারী বলে পাঠালো যদি তোমাদের মহাপুরুষকে দেখার অনুমতি দাও তাহলে সন্ধি মঞ্জুর। ওড়িশার অধিকারী মহাপ্রভুকে গৌড়ে পাঠানোর রাস্তা নিরাপদ করার জন্য চিন্তিত। তিনি মুসলমান অধিকারীর কাছে বার্তা পাঠালেন। দর্শন হতে পারে তবে পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে নিরস্ত্র হয়ে আসতে হবে।

মুসলমান অধিকারী তাতেই রাজি হয়ে চলে প্রভুর দর্শনে। তাঁকে দেখে ওড়িশার অধিকারী অগ্রসর হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং সসম্মানে প্রভুর কাছে নিয়ে গেলেন। প্রভুকে দেখে মুসলমান অধিকারী বিবশ হয়ে ভূতলে পতিত হলো। ওড়িশা অধিকারী তাঁকে তুলে প্রভুর কাছে নিয়ে গেলেন। তখন মুসলমান অধিকারী অশ্রুজলে ভেসে হাতজোড় করে বলল—

—প্রভু, আমি সারা জীবন হিংসা করে কাটিয়েছি। তুমি আমাকে কৃপা করে উদ্ধার কর।

প্রভুর কৃপাদৃষ্টিতে যবন উদ্ধার হলো। তাঁর সর্বাঙ্গ পুলকিত হলো। নেত্রে আনন্দাশ্রু।

প্রভু গৌড়দেশে যাবেন শুনে সেই অধিকারী উল্লসিত হয়ে যাত্রার সব ব্যবস্থা করতে লাগল। এক অতি মজবুত বৃহৎ নৌযানে প্রভু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ পার্ষদদের বসানো হলো। মুসলমান অধিকারী জিজ্ঞাসা করল—

—প্রভু কতদূর যাবেন?

পার্ষদ গোপীনাথ বলল—

—পানিহাটি পর্যন্ত।

মুসলমান অধিকারী বলল— সেই পথে দস্যুর উৎপাত, আমি সৈন্য নিয়ে প্রভুকে গন্তব্যে পৌঁছে দেব। আসলে সেই মুসলমান অধিকারী প্রভুর সান্নিধ্য ছাড়তে চাইছিল না। দশনৌকা সৈন্য নিয়ে সে প্রভুর নৌকার আগে পিছে চলতে লাগল। প্রভুকে মন্ত্রেশ্বর নামক দুষ্ট নদ পার করাল। শেষে পিছলদহ পর্যন্ত এল। সেখান থেকে লোকালয়, অতএব আর ভয় নেই। প্রভু এবার সেই অধিকারীকে ডেকে তাঁর হাতে 'মনোহরা' নামক জগন্নাথের প্রসাদ দিলেন। সেই প্রসাদ পেয়ে অধিকারী উচ্চস্বরে হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুপাত করতে লাগল। এই রূপে সেই মুসলমান অধিকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে অশ্রুজলে বিদায় নিল। পরবর্তীকালে এই অধিকারী পরম ভাগবত ও বিশ্ববরেণ্য বৈষ্ণব হয়েছিলেন। ■

বালুরঘাটে সঙ্ঘ কার্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা কার্যালয় পাঞ্চজন্য ভবনের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান গত ২ মার্চ বালুরঘাট শহরের বিশ্বাসপাড়ায় সুসম্পন্ন হলো। সকাল দশটায় স্থানীয় মাতৃমণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় এবং স্বয়ংসেবক অপূর্ব চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে পূজার্চনা শুরু হয়। বৈদিক শান্তিযজ্ঞ পরিচালনা করেন গঙ্গারামপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী অনুপমানন্দজী মহারাজ এবং বালুরঘাট ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বিদুরানন্দজী মহারাজ। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে স্বয়ংসেবক এবং কার্যকর্তারা সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, সহক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাত, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ঋষিকেশ সাহা, প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, সহ প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, প্রান্ত সহব্যবস্থা প্রমুখ প্রলয় দাস, প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য পবন নাকিপুরিয়া, প্রান্ত ধর্মজাগরণ সংযোজক কৃষ্ণকুমার দাস প্রমুখ। জেলার স্বয়ংসেবক যারা বিভিন্ন স্থানে প্রচারক হিসেবে রয়েছেন এবং যাঁরা এই জেলার প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন তারাও উপস্থিত ছিলেন। পূজা ও শান্তিযজ্ঞ সমাপনান্তে ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন উপস্থিত কার্যকর্তারা। দুপুরে সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে স্থানীয় ক্ষৌরকার পরান চন্দ্র শীল এবং চর্মকার ঝন্টু রবিদাসকে

শাল পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। বিকেলে প্রাচ্য ভারতী হাইস্কুল মাঠে স্বয়ংসেবকদের একত্রীকরণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাস্তাবিক ভাষণ রাখেন প্রবীণ প্রচারক প্রদীপ কুমার দে। সঙ্ঘ কার্যালয় এবং সমাজ নির্মাণে স্বয়ংসেবকদের ভূমিকা বিষয়ে বৌদ্ধিক রাখেন অদ্বৈতচরণ দত্ত।

ত্রিপুরা রাজ্য ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের ডেপুটেশন

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্যোগে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের সংগঠিত ও অসংগঠিত সেক্টরের মজদুরদের ২০ দফা দাবিতে ত্রিপুরার ৮টি জেলায় একযোগে জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে শ্রমিকদের কল্যাণে বিভিন্ন দাবিদাওয়ার উল্লেখ করা হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ ত্রিপুরা প্রদেশ সহ সভাপতি অজিত গোস্বামী।

ফ : 8

শ্রীরামপুরে সরস্বতী শিশুমন্দিরের শুভ উদ্বোধন

গত ১২ মার্চ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথিতে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে বহু আকাঙ্ক্ষিত সরস্বতী শিশুমন্দিরের শুভ উদ্বোধন হলো। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ, ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী মধুময় নাথ, বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক তপন ভড়, পরিষদের হুগলী জেলার পূর্ণকালীন কার্যকর্তা বাবলু মণ্ডল এবং দ্বারহাট্টা শিশুমন্দিরের প্রাধান আচার্য কৌশিক দুলে।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ। উদ্বোধনী ভাষণ দেন শিশু মন্দিরের সভাপতি জয়প্রকাশ মুখোপাধ্যায়। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করেন এবং মেকলের শিক্ষানীতির নাগপাশ থেকে ভারতীয় সংস্কৃতিকে মুক্তির রাস্তা হিসাবে শিশুমন্দিরের আবশ্যকতার উল্লেখ করেন। শ্রীভড় তাঁর ভাষণে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সফলতার কথা, সংস্কারের কথা, ব্যাপ্তির কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেন। শ্রীনাথ শিশুমন্দিরের শুভারম্ভে পুরাতন স্মৃতিচারণ করে আনন্দানুভূতি ব্যক্ত করেন এবং শিশুমন্দিরের সফলতা কামনা করেন। স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আশা প্রকাশ করেন যে মেকলের সুদীর্ঘ অপচেষ্টার ফলেও ভারতের সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, এটি তারই শুভ লক্ষণ। তিনি রাষ্ট্র গঠনে সকলকে আহ্বান জানিয়ে শিশুমন্দিরের সফলতা কামনা করেন। দ্বারহাট্টা শিশু মন্দিরের ভাই-বোনেদের দ্বারা দেশাত্মবোধক গান, নাচ, সুভাষিত, অমৃতবচন, প্রবচন এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। বন্দেমাতরম গানের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্ত বৈঠক

অযোধ্যায় গত ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রবন্ধ সমিতি ও প্রন্যাসী মণ্ডলের বৈঠকের পর গত ৯-১০ মার্চ উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাদেশিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পরিষদের শিলিগুড়িস্থিত প্রান্ত কার্যালয়ে। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বৈঠকের শুভারম্ভ করেন প্রান্ত সভাপতি নারায়ণ মণ্ডল এবং প্রান্ত কার্যকরী সভাপতি উদয়শঙ্কর সরকার। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ স্বপন মুখার্জি, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত মন্ত্রী লক্ষ্মণ বনসল এবং প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী অনুপ মণ্ডল। শ্রীমুখার্জি কেন্দ্রীয় বৈঠকের বিষয়গুলি বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কার্যকর্তাদের সামনে তুলে ধরেন এবং আগামীতে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং জেলার সাংগঠনিক স্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন। প্রান্ত সভাপতি নারায়ণ মণ্ডলের সমাপ্তি ভাষণের পর বৈঠকের সমাপ্তি হয়।

রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমে সংস্কৃতভারতীর প্রান্ত সমীক্ষা যোজনা বৈঠক

গত ৯-১০ মার্চ সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সমীক্ষা যোজনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো হুগলী জেলার রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমে। দুদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত থেকে পথনির্দেশ করেন সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় সহ প্রশিক্ষণ প্রমুখ ড. সচীন কাঠালে। উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতীর পূর্বক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী প্রণব নন্দ, প্রান্ত সভাপতি ড. তন্ময় ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে, ক্ষেত্র কার্যকারিণীর সদস্য গোবিন্দ ঘোষ, হুগলী বিভাগ প্রচারক নয়ন মাজী এবং প্রেমমন্দির আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ। দুদিনের বৈঠক পরিচালনা করেন সংস্কৃতভারতীর প্রান্ত সম্পাদক সন্তু দত্ত এবং প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ বিজয় দত্ত।

শিলিগুড়িতে সোশ্যাল মিডিয়া কনক্লেভ

বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের উদ্যোগে গত ৩ মার্চ শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনির সারদা শিশুতীর্থ বিদ্যামন্দিরের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজন করা হয় সোস্যাল মিডিয়া কনক্লেভ। জাতীয়তাবাদী বিমর্শ নির্মাণে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে এত বড়ো সেমিনার এই রাজ্যে প্রথম। বক্তা হিসেবে ছিলেন রিপাবলিক ভারত চ্যানেলের প্রাক্তন সম্পাদক প্রদীপ ভাণ্ডারী। উপস্থিত ছিলেন পূর্বক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ সুব্রত চ্যাটার্জি, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ বিবেক সরাফ এবং প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সমীর ঘোষ। শ্রীভাণ্ডারী বৈচারিক লড়াইয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রাষ্ট্রবাদী মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত লড়াইয়ের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যারা সংগঠিত তারাই ন্যারেটিভ সেট করতে পারে। এর পাশাপাশি তিনি সোশ্যাল মিডিয়াকে কেবলমাত্র বিনোদনের জন্য নয়, রাষ্ট্র নির্মাণে উপযোগীভাবে ব্যবহার করার জন্য যুবসমাজকে আহ্বান জানান। প্রশ্নোত্তর পর্বে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচার প্রমুখ নরেন্দ্র ঠাকুর উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোজনক উত্তর দেন। সমাপ্তি ভাষণ তিনিই রাখেন। রাষ্ট্রগান বন্দে মাতরমের পর সভার সমাপ্তি হয়।

জাতীয় গ্রন্থাগারে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের আলোচনা সভা

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় গত ৩ মার্চ কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাকক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের দশা ও দিশা'। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি তথা অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য কল্যাণ কুমার মণ্ডল, রাজ্য সহসভাপতি আশিস সরকার, প্রান্ত প্রচার প্রমুখ ড. কল্যাণ জানা, রাজ্য সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায়, পূর্ব ও উত্তর-পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক শ্রীনিবাস, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. গৌতম সাহা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী বসন্ত শেঠিয়া।

উদ্বোধনী ভাষণে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ কী, বৈশিষ্ট্য কী, কারা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, কিষাণ সঙ্ঘের কাজ ও দায়িত্ব কী ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন শ্রীমণ্ডল। শ্রী শেঠিয়া বলেন, এরকম আলোচনা সভা দ্বারা কৃষক সমাজকে কীভাবে সংগঠিত করা যায় তার প্রয়াস করা চলছে। কৃষির দ্বারা জনকল্যাণের মাধ্যমে দেশের উন্নতি করা সম্ভব।

অধ্যাপক সাহা বলেন, পড়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। কৃষকদেরও বই পড়া জরুরি। কৃষকের আয় বাড়লে দেশের উন্নতি সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় কৃষিদপ্তরও কৃষকদের উন্নতি সাধনে এগিয়ে এসেছে। আবহাওয়া সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করতে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে লাইব্রেরির বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের মহা নির্দেশক অধ্যাপক অজয় প্রতাপ সিংহ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন যোজনার মধ্য দিয়ে দেশে উন্নতি সাধনের যে কাজে নেমে নেমেছে তাতে কৃষকদেরও বড়ো ভূমিকা আছে।

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সাংবাদিক সম্মেলন

ডব্লিউটিওর ১৩তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন গত ২৬-২৯ ফেব্রুয়ারি আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। ভারতের জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রধান বিষয়গুলি স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ দ্বারা অনুসরণ করা হচ্ছে তা সম্মেলনে উত্থাপন যাতে করা হয় সেজন্য গত ২৩ ফেব্রুয়ারি স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চে এই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় সহ-সংযোজক ড. ধনপতরাম আগরওয়াল।

ড. আগরওয়াল জানান, এসজেএম বিশ্বাস করে যে খাদ্য সুরক্ষার জন্য এবং দরিদ্র জনগণের জন্য ভরতুকিযুক্ত মূল্যে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এবং বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মজুদ রাখার বিষয়ে কোনও আপোশ করা উচিত নয়।

মৎস্য চাষে ভরতুকি বাদ দেওয়ার বিষয়ে সরকারের আপোশ করা উচিত নয়, কারণ এটি বিদ্যমান এজেন্ডার বিষয় নয় এবং ডব্লিউটিওতে কৃষির অংশ নয়। শ্রম, পরিবেশ যেমন কার্বন ট্যাক্সের নামে কোনো অশুল্ক বাধা অনুমোদন করা উচিত নয়। পরিষেবা খাত : প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য Mode4-এর অধীনে বাণিজ্য সম্পর্কিত পরিষেবাগুলিতে সাধারণ চুক্তির অধীনে শ্রম ও পেশাদার লোকেদের বাজারে প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য ভিসা বিধিগুলিকে উদারীকরণ করা দরকার।

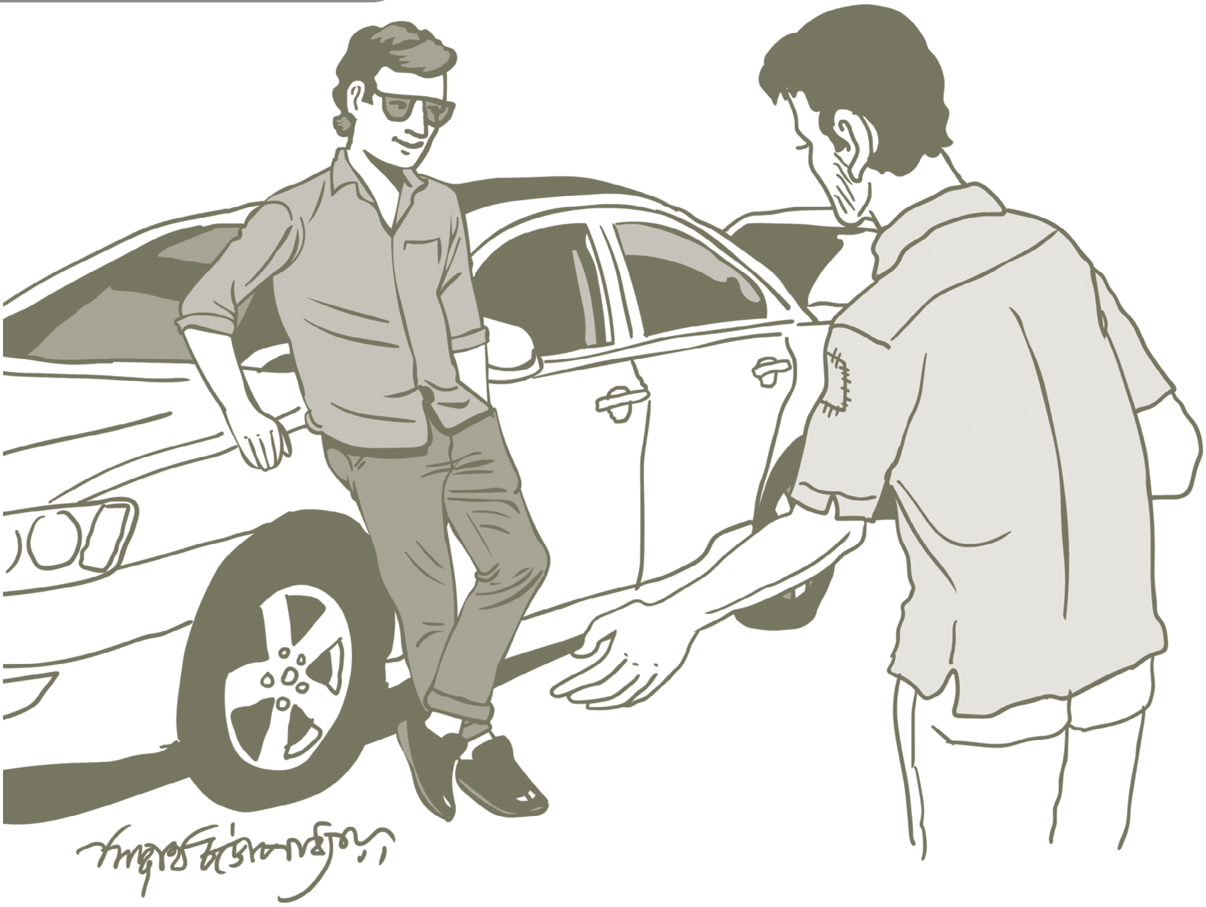

তমসা মা জ্যোতির্গময়

কালাচাঁদ রায়

আমি ঈশিতা। মনোময় আমার দাদা—আর সুধাময়দা আমার দাদার বন্ধু। সেই ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি ঠিক কেমন যেন। দাদার বন্ধু অথচ দাদার কাছে কেমন সংকুচিত হয়ে থাকে। আমাকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। চোখে চোখে ধরা পড়ে গেলে কেমন বিপন্ন বধির হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সত্যি কথা বলতে কী সুধাময়দাকে নিয়ে মজা করতে গিয়েই থমকে যাই। আসলে লোকটা বেসিকেলি ভালো। ওর কথা, ওর কষ্টের কথা ভাবলে থমকে যেতে হয়। কেন এমন হয়? দাদা বলেছিল, সুধা, কাল ভোরবেলায় দেখা করিস। শুধু এইটুকু। দাদার আর খেয়াল নেই। আসলে দাদা অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফেরে। রাতে শুতে শুতেও দেরি করে ফেলে। ফলে দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে। আগের দিন কাকে কী কথা দিয়েছে কিছুই মনে থাকে না। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই, দাদা বলেছে খুব ভোরবেলায় দেখা করিস, সেইমতো সুধাময়দা ছ'টার আগেই এসে গেটে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আসলে সুধাময়দা এত গরিব যে ছোটোবেলা থেকে দুঃখ-কষ্ট পেরিয়েও নিজেকে

আজও থিতু করতে পারেনি। কষ্টের জীবন যেভাবে শুরু হয় আর কী! সুধাময়দার বাবা ছিলেন একটি ছোটো কারখানার শ্রমিক। মাসের শেষে সামান্যই মাইনে পেতেন। ওই সামান্য অর্থেই হয়তো সংসার খরচ কোনোমতে ঠেকা দিতে পারতেন। কিন্তু বিধি বাম, সুধাময়দার মা ছিলেন চিররুগি। তিনি দিন দিন কেমন যেন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। রক্তশূন্য হয়ে এত দুর্বল হয়ে পড়লেন—একদিন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন। সুধাময়দার বয়স তখন মাত্র বারো-তেরো। মাতৃশোক সংসারে কোনো ছেলে-মেয়েই মেনে নিতে পারে না, সুধাময়দাও পারেনি। মা চলে যাওয়াতে সে যেন অসীম শূন্যতার আঁধারে হারিয়ে যেতে লাগলো। ভাগ্যিস ওর ঠাকুমা ছিল। লোক মারফত খবর পেয়ে ঠাকুমা ছুটতে ছুটতে হাসপাতালে যায়। দেখে, হাসপাতাল চাতাল চত্বরের এককোনায় স্ট্রেচারে পড়ে আছে সুধাময়ের মা! মাথার ডানপাশে নিশ্চল অশ্রুভরা চোখে দুঃখ দুঃখ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সুধাময়ের বাবা প্রাণকিশোর। আর সুধাময় মায়ের পায়ে মাথা রেখে অঝোরে কেঁদেই চলেছে। ঠাকুমা ওকে যতই কাছে টেনে বুকে তুলে নিতে চাইছেন সুধাময় ততই চিৎকার কেঁদে কেঁদে বলছে—না, আমার মা মরে যায়নি—আমি মা'র কাছে থাকবো। কে তখন ওই বালককে বোঝায় মানুষের শত চেষ্টাতেও, শত কান্নাতেও তার মা কোনোদিনই ফিরে আসবেন না।

এইভাবে কালের নিয়মে সুধাময় মাতৃহীন হলেও ওর বাবা ওর প্রতি যত্নের কোনো ত্রুটি রাখেননি। তাছাড়া ঠাকুমাতো ছিলেনই। ঠাকুমা সুধার মায়ের মৃত্যুর দিন থেকেই কঠিন শপথ নিয়ে বুকে বেঁধেছিলেন। সুধাকে বড়ো করতে হবে, দশ জনের একজন করে মানুষ করতে হবে। কিন্তু মানুষ করতে গেলে যেটা প্রথম প্রয়োজন সেটা হলো সুধার লেখাপড়া শেখার সুবন্দোবস্ত করা। সেখানেও ঘোর প্রতিবন্ধকতা,ঘোর অনিশ্চয়তা! কেমন করে হবে? আজকের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়ে পড়াশুনা চালাতে অর্থের প্রয়োজন। সংসারে থেকে সুধার মায়ের মৃত্যুর পর ঠাকুমা যেমন বুকে আগলে ধরেছেন সুধাকে, তেমনি বাবা প্রাণকিশোরও প্রাণপাত করছিলেন ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার। কিন্তু মানুষ ভাবলেই তো তার নাগালে চলে আসে না সবকিছু। তাছাড়া যে সমাজ ব্যবস্থায় চলে অবিরাম সংঘাত, দুর্নীতি, বেনিয়ম, সেই আবর্তে প্রাণকিশোরের মতো মানুষরা বাঁচবেন কেমন করে? সুধার মাধ্যমিক পরীক্ষার বছরের গোড়াতেই প্রাণকিশোরের সংসারে ঘটলো চরম বিপর্যয়। প্রাণকিশোরের কারখানায় ধর্মঘট আর ধর্মঘটের জেরবারে লকআউট ঘোষিত হলো। প্রাণকিশোর পড়লেন অথই সাগরে। কী করে জোগাড় করবেন ছেলের সিলেবাস সম্পর্কিত বই—মাধ্যমিক পরীক্ষার ফিজ?

ছেলের হাতধরে ফিরছেন প্রাণকিশোর। আজ মাধ্যমিকের টেস্টের রেজাল্ট বেরিয়েছে। সুধা অনেক বিপর্যয়ের মধ্যেও ভালো ফল করেছে। আগামীকালের মধ্যেই জমা দিতে হবে পরীক্ষার ফি ও অন্যান্য কিছু। কিন্তু প্রাণকিশোরের হাতে তো একটি পয়সাও নেই। কী করবেন তিনি? ধার করবেন? সে পথও বন্ধ। কেননা ধার করেই তার সংসার চলে, নতুন করে তাকে কে ধার দেবে?

গুমোট দুপুর। ভাঙা মেঘের ফাঁকে কখনো কখনো এক চিলতে রোদ ভেসে আসে। প্রাণকিশোর স্কুল প্রাঙ্গণের একপাশে বকুল গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে ছেলের হাত ধরে চিন্তার অথই সাগরে ভাসছেন।

স্কুলের বড়ো গেটটার মধ্য দিয়ে ঢুকলো বাদামি রঙের এক অ্যামবাসাডার। গাড়ি থেকে বাবার হাত ধরে নামলো মনোময়। মনোময় ঈশিতার দাদা। মনোময় বাঁদিকে তাকিয়ে সুধাময়কে দেখতে পায়। বাবার হাত ধরে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে সুধাময়। মনোময় ছুটে গিয়ে সুধাময়ের হাত ধরে। বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বাবাকে কাছে আসতে বলে।

মনোময়ের বাবা জ্যোতির্ময় ছেলের ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে যান, জিজ্ঞাসু চোখে সুধাময় তার বাবাকে দেখেন।

মনোময় কথা বলে, —বাবা, ওর নাম সুধাময়, আমরা একই ক্লাসে পড়ি, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড।

তাই, তা তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন সুধাময়, এনি প্রব্লেম?

এবারে হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়ে সুধাময়। কান্নাজড়িত গলায় বলে, স্যার, আমরা ভীষণ গরিব, পরীক্ষার ফিজের টাকা জোগাড় করতে পারিনি বলে—

ছেলের কথায় মুখ কাচুমাচু হয়ে যায় প্রাণকিশোরের। বলেন, স্যার, আপনি দেরি করবেন না, সবারই ফরম্ ফিলাপ হচ্ছে, আমি অকর্মণ্য বাপ, ছেলের হাত ধরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাঁদছি।

—আপনার বাড়ি কোন্‌দিকে, কী করেন আপনি?

জ্যোতির্ময়বাবুর প্রশ্নের উত্তরে প্রাণকিশোর বলেন, করতাম, কারখানায় কাজ করতমে। কারখানা লকআউট, কাজেই—

—বুঝেছি, আপনি ছেলেকে নিয়ে আসুন আমার সঙ্গে।

—আপনি।

—আরে মশাই শুনলেন না, ছেলে বললো আপনার ছেলে ওর প্রিয় বন্ধু, তাই বন্ধুর বাবা হয়ে আমি এইটুকু করতে পারবো না?

সেই শুরু। অসম দু'টি পরিবার ধীরে ধীরে কেমন আত্মীয়তা বন্ধনের মতো ধরা দেয়। কিন্তু সেইদিন সেই স্কুল বয়স থেকেই ঈশিতা দেখেছে, ওর দাদা সুধাময়কে প্রাণের একজন বলে ভাবলেও সুধাময় কিন্তু সংকোচের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি। জানে না ভালোবাসা কতখানি—তবে ভক্তি আর ভয়ই করে বেশি।

এখন তো আর স্কুল-কলেজ নেই। দাদা গ্র্যাজুয়েশনের পর এমবিএ করে বড়ো কোম্পানির এক্‌জিকিউটিভ। সুধাময়ও বিএ পাশ করেছে,তবে চাকরি পায়নি। চাকরির খোঁজে তাই চরকিপাক ঘোরে, আজ কী জন্যে সেই সকাল-ভোর থেকে সুধাময় দাঁড়িয়ে আছে জানে না ঈশিতা।

এদিকে সকাল আটটা পেরিয়ে গেল। এখনো দাদার ওঠার নাম নেই। হঠাৎ ঈশিতা দেখলো, গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিশ্চল সুধাময়দার দেহ নড়ে উঠলো। ঈশিতার বুকটাও কেমন করে উঠলো, আহারে! শুধু কী তাই? দীর্ঘদিন বিভিন্ন সময়ে সুধাময়ের সান্নিধ্যে থাকার জন্য ওর মনটাও মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে পড়ে। কেন এমন হয়? সকালের সূর্যকিরণের ঝিল্‌মিল আকাশের দিকে তাকিয়ে অকারণেই ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো ঈশিতার।

ডাকবে কি? বহুবার পরীক্ষা করেছে। ঈশিতা ডাকলে ও কেমন আরও সংকুচিত হয়ে যায়। তাই ঈশিতা সুধাময়কে না ডেকে নিজের দাদা মনোময়কে ডাকতে ঘরে ঢুকলো।

—অ্যাই দাদা, ওঠ ওঠ,—

—কেন রে ডাকছিস কেন, ক'টা বাজে?

—যটাই বাজুক—ওঠ।

—বল না ক'টা বাজে?

—আটটা। সুধাময়দা সেই ভোর থেকে দাঁড়িয়ে আছে— জানিস।

—ও একটা গাড়ল। ও কী জানে না আমার ভোর সকাল আটটায়।

—ডাক ডাক, সুধাকে ডাক।

ঈশিতা সুধাকে ডাকতে বেরিয়ে যায়।

সুধাকে নিয়ে ওপরে উঠে আসে ঈশিতা। ততক্ষণে মনোময় উঠে পড়েছে। টুথব্রাশে পেস্ট লাগাতে লাগাতে সুধাকে সামনে পেয়ে বলে, সত্যিই তুই একটা হাঁদারাম। এসেছিস ভালো কথা। সোজা ওপরে উঠে আয়। ঈশিতার পড়ার টেবিলে গিয়ে বোস্। ওতো তোর জন্যই অপেক্ষা করে বসে থাকে।

—দাদা, হচ্ছেটা কী? মুখে যেন কিছুই আটকায় না।

—তুই চুপ কর মুখপুড়ি। সত্যি করে বলতো, সুধা না এলে তোর মন খারাপ হয় না?

ঈশিতার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে যায়। মুখ ভার করে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, তোর বন্ধু---তাকেই জিজ্ঞেস কর না। ওদের ভাই-বোনের সরল কথাবার্তার মাঝে পড়ে সুধা যেন আরও বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

—সুধাদা, তুমি চা খাবে তো?

—জিজ্ঞেস করছিস কেন? দিলেই তো পারিস।

—না পারি না, এখন চা দিলে না খেয়ে বলবে, আমাকে চা দিওনা টুবু, অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে।

—আর তুইও ওর কথা শুনে—

ঈশিতা মুখ ফস্‌কে বলে ফেলে, আমার বুঝি কষ্ট হয় না।

—টুবু, তুই দুঃখ পেয়েছিস? অ্যাই সুধা, তুই মিছিমিছি টুবুকে দুঃখ দিস্ কেন বলতো?

—অ্যাই দাদা, থাম্ না—বাথরুমে যাচ্ছিস যা, তাড়াতাড়ি ফিরে আয়। আমার চা কিন্তু রেডি।

—ও কে! শিস্ দিতে দিতে বাথরুমে ঢুকে যায় মনোময়। ঈশিতা চা আর বিস্কিট সুধাময়ের দিকে এগিয়ে ধরে। সুধা নীরবে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নেয়। টুবু এবারে সরাসরি সুধাময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

তোমার ঠাকুমা কেমন আছেন?

—ভালো।

—শুনলাম মাঝে শরীর খারাপ হয়েছিল?

—ও কিছু না, বয়স হয়েছে তো।

—ডাক্তার দেখিয়েছ?

—টুবু, তুমি বুঝতে পারছো না, আমাদের এই গরিবদের একটু আধটুক্ অসুখে ডাক্তারের কাছে ছুটতে পারি না। তাছাড়া—

—তাছাড়া জানি। টুবু মুখটা ভার করে মাথা নীচু করে।

—আমার অন্যায় হয়েছে টুবু তোমাকে ঠিক—

—আমাকে তোমার কিছু বোঝাতে হবে না। আমি জানি তুমি ইচ্ছে করেই আমাকে দুঃখ দিতে চাও। কথাগুলো বলে টুবু দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

সুধাময় বিস্বাদ-অস্থির যন্ত্রণা প্রকাশ করতে পারে না। স্তব্ধ মুহূর্তের দাসত্ব করতে চায়ের কাপ হাতে নির্বাক বসে থাকে। আবার হঠাৎ টুবু সুধাময়ের মুখোমুখি হয়। প্রশ্ন করে—

বিকেলে তুমি বাড়ি থাকবে?

সুধাময় উত্তর দেবার আগেই মনোময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে পালটা প্রশ্ন করে ঈশিতাকে। কেন বলতো?

আমি সুধাময়দার বাড়ি যাব। ঠাকুমা অসুস্থ।

জানি তো, অ্যাই সুধা, তুই ঠাকুমাকে ডাক্তার আঙ্কেলের কাছে নিয়ে যাসনি?

সুধাময় মুখ কাঁচুমাচু করে ভ্যাবলার মতো তাকায়।

আসলে।

তোমাকে আর কৈফিয়ত দিতে হবে না, আমি আজই ঠাকুমাকে ডাক্তার আঙ্কেলের কাছে নিয়ে যাব।

কিন্তু সুধা তো আজ বিকেলে থাকতে পারবে না।

কেন—দাদার কথায় ঘুরে দাঁড়ায় ঈশিতা।

কী ব্যাপার! কিরে সুধা, তোর চাকরি পাওয়ার খবরটা বলিসনি ঈশিকে?

— আসলে—

— ও আসল নিয়েই পড়ে থাক, আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না।

— আসলে।

— তোকে আর আসলে কিছু করতে হবে না। সন্ধ্যেবেলায় আমাদের বাড়িতে আসছিস্ তো?

— নি-নিশ্চয়। মাসিমা-মেশোমশাইকে প্রণাম করবে না!

— মিষ্টি আনিস্ কিন্তু।

—সে আর বলতে, টুবু—

ঈশিতা সুধাময়ের মুখোমুখি দাঁড়ায়। বলে, কিছু বলবে?

— আসলে তোমাকে একটা সারপ্রাইজ—

— থাক্ , আমার কথা ভাবতে হবে না।

— টুবু, জানতে চাইলে না, কোথায় কীসে আমার চাকরি হলো?

— কোথায় কত বড়ো পোস্টে তুমি চাকরি পেয়েছ সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা তুমি চাকরি পেয়েছো। বড়ো ছোটো কোনো ব্যাপার নয়।

খুশির আনন্দে টুবু ভেতরে চলে যায়। সুধাময় উঠে দাঁড়ায়। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মনোময় ঘরে ঢুকে বলে,

— উঠচিস্ কেন?

— বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিই।

--- আমরা সবাই মিলে যাব। এখন বোস্---খাওয়া-দাওয়া করে একসঙ্গে বেরোবো।

বিকেলে একই সময়ে প্রাত্যাহিক বৈকালিক ভ্রমণে বের হন জ্যোতির্ময়। দু'হাজার তিনে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর এই অভ্যেসটা একান্ত করে বেঁধে ফেলেছেন তিনি। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর চোখে একটু তন্দ্রা আসে বটে, জ্যোতির্ময় একটু শুয়েও নেন, তবে বেশিক্ষণ নয়। আধঘণ্টা গড়াগড়ি করে উঠে পড়েন। বেরনোর আগে পর্যন্ত সারাদুপুর আপনমনে একা একা তাস খেলেন, বই পড়েন, খবরের কাগজ পড়ে সময় কাটান। চারটে বাজলেই বাথরুমে যান। বাথরুম থেকে ফিরে জামাকাপড় পরেন। তারপর গিন্নিকে ডাকেন,

— উঠলে নাকি—

গিন্নি সাড়া দেন। বলেন,

— আমার জর্দা ফুরিয়েছে, মনে করে এনো কিন্তু। প্রসন্ন হাসেন জ্যোতির্ময় স্ত্রীকে একটু খোঁটা দিয়ে বলেন,

— অনু, এটা তুমি কী বললে—তোমার ফরমাসি জর্দা আনতে আমি ভুলে যাব?

— কেন? ভুল কী বলেছি?

--- আরে---আমার কী কখনও ভুল হয়েছে?

— আগে হতো না—ইদানীং—

— ইদানীং কী হয়েছে?

— তোমাদের বাপ-বেটির গুমোর হয়েছে।

— গুমোর!

— এখন যেখানে যাচ্ছ যাও, ভালোমতো

ঘুরে এস, পরে ব্যাখ্যা শুনো।

জ্যোতির্ময় ভেতরে ভেতরে অপ্রসন্ন হলেও মুখে হাসি ধরে রাখলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, বেশ তাই হবে, ফিরেই শুনবো গুমোরের কথা।

অনুপ্রভা রেলিঙে এসে দাঁড়ালেন। এটা তার অভ্যাস। বিকেলে স্বামী যখন পার্কে বেড়াতে যান, উনি রেলিঙে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেন। কিছুক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে সংসারের কাজে মন দেন। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরবে ছেলে-মেয়েরা। তাদের চা জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। রান্নার বউ সনকা এসে পড়লে ওকে সব গুছিয়ে দিয়ে তবে শান্তি। পার্কের পশ্চিম কোণে কৃষ্ণচূড়া গাছটার মাথার উপরে সূর্যটা টুক করে ডুবে গেল। সারা দিগন্তের চড়াচড়ে কেমন নেমে এল ধূসর আবিলতা। বৃদ্ধদের প্রাত্যাহিক দুঃখ-কষ্ট, অতীত স্মৃতিচারণ নিয়মমতো থেমে গেল। জ্যোতির্ময় উঠলেন। তাকে আবার ওই মোড়ের মুখে পানের দোকান থেকে অনুর জন্য কিনতে হবে ফরমাটি জর্দা। আরও একটা জিনিস কিনতে হবে। গরম গরম ফুলুরি। অনু খুব পছন্দ করে। ছেলে-মেয়েরা বকবে বলে অনু লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে নেয়। জ্যোতির্ময়ও কখনোসখনো মুখে পোরেন। অদ্ভুত একটা রুচিকর স্বাদ।

বাড়ির সামনে পিচ করা রাস্তায় বিজলিবাতি জ্বলে উঠেছে। বাস, লরি, ট্যাক্সি, ম্যাটাডোর অহরহ সমানে ছুটে চলেছে। জ্যোতির্ময় নিশ্চিন্তে নিজের গেট খুলে ভেতরে ঢোকেন। প্রতিদিন অনুপ্রভা যেমন বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষায় থাকেন—আজ বারান্দা ফাঁকা! জ্যোতির্ময় ভ্রূকুঁচকে থমকে দাঁড়ালেন। আবার কার কী হলো? কলিংবেলের সুইচ টিপলেন। সনকা এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো।

— কীরে তোর দিদা কোথায়?

-- দিদা ওপরের বারান্দায় বসে আছে। তুমি ওপরে যাও আমি তোমার আর দিদার চা নিয়ে যাচ্ছি।

জ্যোতির্ময় ওপরে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখেন।

অনুপ্রভা মুখ ভার করে বসে আছেন। জ্যোতির্ময় একটিবার থমকে দাড়িয়ে আবার হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন স্ত্রীর দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, —কীগো, মুখ কালো করে বসে কেন?

—আমার ইচ্ছে তাই, আমার জন্য কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।

জ্যোতির্ময় বুঝলেন---নিশ্চয় বড়ো ধরনের কিছু ঘটেছে। কী হতে পারে? আজকাল আবার ঈশির দিকেও বাঁকা চোখে তাকাতে দেখেছেন স্ত্রীকে। কিন্তু কারণটা অনুমান করতে পারছেন না। নাকি মনোময় নতুন কোনো মন খারাপের কারণ ঘটিয়েছে? যাই হোক, মনের দ্বিধা-সংকোচ কাটিয়ে স্ত্রীর দিকে গরম ফুলুরির ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরেন জ্যোতির্ময়।

—নাও ধরো।

—কী?

—গরম গরম ফুলুরি, তোমার জন্য।

—থাক্,মন ভোলানো কথা বলতে হবে না।

—আহা, কী হয়েছে বলবে তো।

—কেন বলতে হবে কেন, তোমার চোখ নেই, দেখতে পাচ্ছো না? জ্যোতির্ময় হতোদ্যম হন। জর্দার কৌটোটা খাবার টেবিলে রেখে চোরাচোখে আর একবার স্ত্রীর দিকে তাকান। তারপর বিষাদের সুরে বলেন, আমার হয়েছে যত জ্বালা, আগে হাঁটলেও শালা, পেছনে হাঁটলেও শালা!

—কেন,তোমার আবার জ্বালা কীসের? ছেলে-মেয়ে দু'জনেই তোমার হাতের মুঠোয়, তোমার কথা শোনে—

---কেন ওদের দু'জনের নামে মিথ্যে বদনাম দিচ্ছ, দু'জনেইতো মা বলতে অজ্ঞান।

—থাক্, অজ্ঞান হয়ে কাজ নেই।

---অনু, তুমি হচ্ছো সংসারের কর্ত্রী। তোমার মুখের দিকে আমরা তিনটে প্রাণী তাকিয়ে।

এবারে ফোঁস করে উঠলেন অনুপ্রভা। বললেন,

—আবার মন ভোলানো কথা বলছো?

জ্যোতির্ময় সুযোগ পেয়ে স্ত্রীর মুখোমুখি হন। দু'হাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে আনেন। তারপর গাঢ় সুরে বলেন, তুমি বোঝো না অনু, তুমি কষ্ট পেলে আমার বুক কান্নায় ভরে ওঠে। বল না গো কী হয়েছে তোমার?

অনুপ্রভার চোখেও জল! যন্ত্রণার কান্নাকে অবদলিত করে বলেন, মেয়ের বেলায় যখন হলো না, তখন ভেবেছিলাম– ছেলেটাকে নিয়ে মনের সাধ মেটাবো, সে গুড়েও বালি।

—কেন, মনোময় কী করলো?

—আমাদের ছেলে মনো, সেও যে তলে তলে এত কিছু ভেবে রেখেছে—

—কী ভেবে রেখেছে মনো? আমাকে খুলে বল না অনু।

—কী বলবো? তুমি দেখতে পাচ্ছো না, শুনতে পাচ্ছো না— অনুপ্রভা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

জ্যোতির্ময় কিছু বুঝতে না পেরে হতাশ হয়ে স্ত্রীর পাশে ধপ্ করে বসে পড়লেন। অনুপ্রভার কান্নার দমকটা কমলে আদরের সুরে স্ত্রীকে বললেন, বিশ্বাস করো অনু, কী ঘটেছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এবারে অনুর কণ্ঠে অনুযোগের সুর।

—তুমি তো চিরটা কাল ছেলে-মেয়েকে মাথায় তুলে রাখলে।

—এ তুমি কী বলছো অনু, নিজেদের ছেলে-মেয়েদের আদর- ভালোবাসার দাবি মেটানো পাপ?

---আমি তো সে কথা বলিনি, ছেলে-মেয়েকে যেমন ভালোবাসবে, আদর দেবে—প্রয়োজনে শাসনও করতে হয়।

—তো—

—তুমি কি জান,তোমার ছেলে নিজের বিয়ে নিজেই ঠিক করেছে?

—কই জানিনা তো!

—অথচ এই তুমি ছেলের বিয়ের জন্য কত জায়গায় মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ, কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ভেবে রেখেচো, আমি তো আবার আত্মীয়-বন্ধুমহলে কত সুন্দরী-সুন্দরী পাত্রী তোমার ছেলেকে দেখিয়েছি, আর তোমার ছেলে কী বলেছে জান, তিনি এখন বিয়ে করবেন না! বোনের বিয়ে হলে, তবেই নিজের বিয়ের কথা ভাববে। আসলে তলে তলে দুই ভাই-বোনে এতদূর এগিয়েছে,আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি। বুঝতেও পারিনি। জ্যোতির্ময় চুপ করে শুনছিলেন স্ত্রীর কথা। এবারে উঠে দাঁড়ালেন, অনুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এতসব কথা তুমি জানলে কোথা থেকে?

—দুপুরে তুমি যখন ঘেয়ে ঘুমোচ্ছিলে, মনো ফোন করেছিল।

—ফোনে এইসব কথা বলছিল?

—শুধু এই সবই নয়,সবটা শুনলে তোমার মাথা গরম হয়ে যাবে।

---ধুত্তোরি ছাই, সবটা খুলে বল না তাড়াতাড়ি।

—তোমার আদরের বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা

মেয়ে বলেছে, সে নাকি সুধাময়কে বিয়ে করবে। সুধাময়ের চাকরি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল আর—

—আর?

—তোমার ছেলে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান, সে কায়দা করে জানিয়েছে, তার নির্বাচিত মেয়েকে দেখাতে সুধাময় আমাকে নিয়ে যাবে। আমি শুধু মনোকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর বাবা এসব মেনে নেবেন?

—মনো উত্তরে কী বললো?

—মনোর উত্তর শোনার আগে, আমি তোমার মতামতটা জানতে চাই।

—আমার তো শুনে আনন্দ হচ্ছে, গর্বে বুকটা ভরে যাচ্ছে। আমাদের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন নিজেরাই ঠিক করেছে।

আচ্ছা, মেয়েটা কে, বললে না তো?

ঠিক এইরকম ক্লাইম্যাক্সে মুহূর্তে প্রবেশ করে তিনজন। প্রথমে ঈশিতা, তারপরে মনোময়, সবশেষে সুধাময়। তিনজনের ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই এতক্ষণের স্বামী-স্ত্রীর চাপান-উতোর থেমে গেল। মনে হলো ঘরে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকেছে। জানলা পথে আকাশে দেখা গেল, অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র। চাঁদটা আকাশের এ দিগন্ত থেকে ছুটে যাচ্ছে অন্য কোনো দিগন্তে। স্তব্ধতার মুহূর্তে দূর থেকে ভেসে আসছে রবীন্দ্র সংগীতের কলি—'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে / দেখতে আমি পাইনি।' নীরবতা ভঙ্গ করে মনোময় বললো, মা, তোমাকে কেমন উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে, শরীর

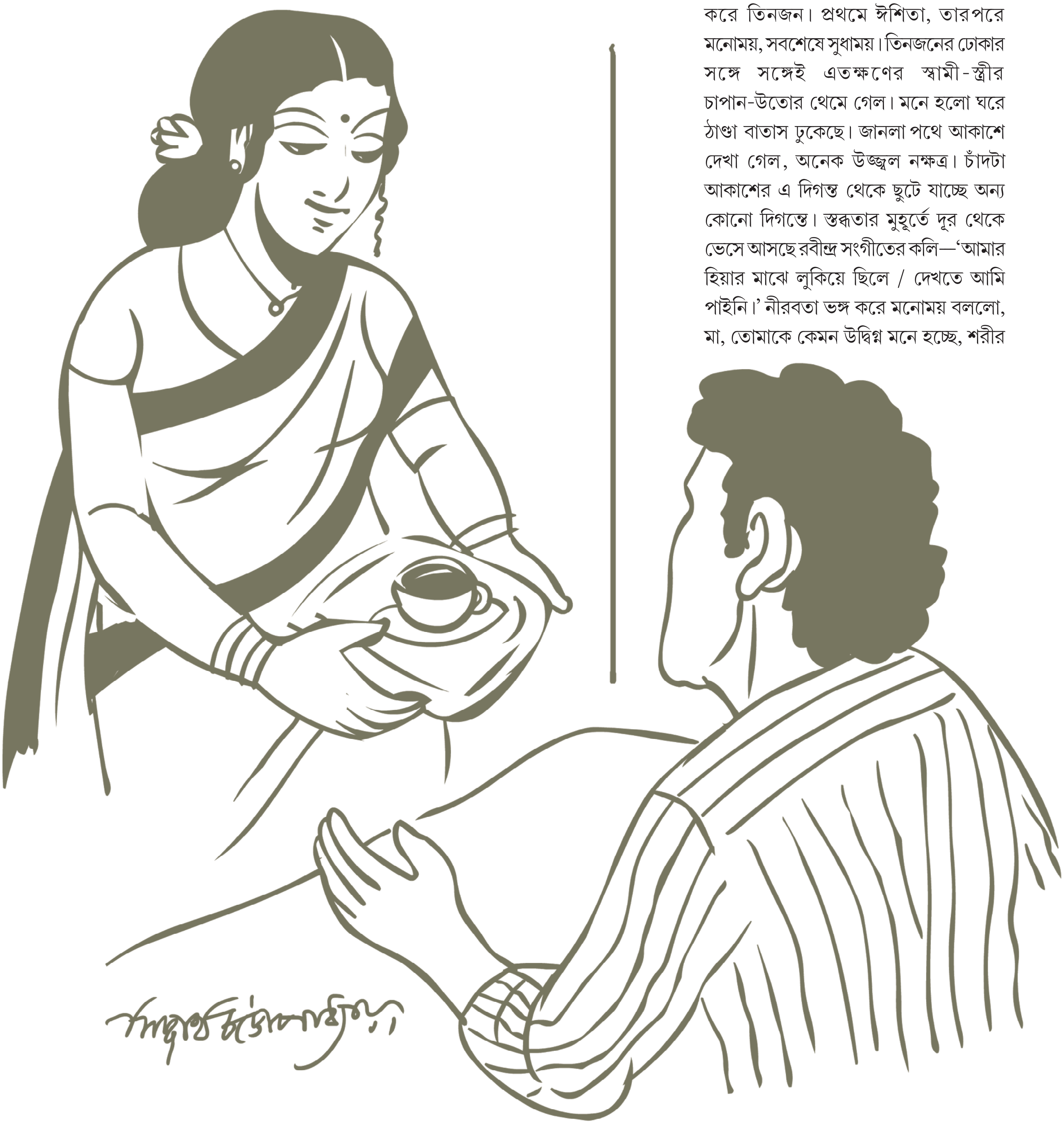

ফঃ ৫

খারাপ করছে? অনুপ্রভা সরাসরি মনোময়ের চোখে চোখ রাখলেন। তারপর হঠাৎ উদ্‌গত কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

—কী হলো মা, এনি প্রবলেম? মনোময় ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। ঈশিতাও ছুটে মা'র কাছে যায়।

—ছেড়ে দে আমায়, আমি তোর মা নই, আমি যদি মা হতেম তাহলে তুই, কথা শেষ করতে পারেন না অনুপ্রভা, বিষন্ন আবেগে বিধ্বস্ত মনে হয় তাকে। মনোময় মাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও মা, তোমাকে আমি ভালবাসি— কথা দিয়েচি !

—কী কথা দিয়েচ, যে কথা তুমি তোমার মা'কে বলতে পারনি?

—আসলে—

—আসলে কী?

—আমি সুধার চাকরির ব্যাপারে খুব ওরিড ছিলাম।

—সুধার চাকরির সঙ্গে তোমার মেয়েপছন্দ ও বিয়ের কী সম্পর্ক? বাবার প্রশ্নে ঈশিতাকেও বিব্রত মনে হয়।

ততক্ষণে মনোময় নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, টুবু আমাকে বলে রেখেছিল, সুধার চাকরি হলেই, টুবু ওকে বিয়ে করবে। তাই—

—তাই তুমি সুধার চাকরির ব্যাপারে এত ওরিড ছিলে?

---না বাবা, কথাটা এভাবে নিও না, আসলে, সুধা আর কতদিন বেকার থাকবে।

—বেশ, এবারে মেয়েটির সম্পর্কে কিছু বল তো।

মনোময় সুধাকে ইঙ্গিত করে। সুধাময় এতক্ষণ স্থানুবৎ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। মনোময়ের ইঙ্গিতে নড়ে ওঠে। টুবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে সুধা বলে, তমসা সম্পর্কে বলার আগে—টুবু, এসো আমরা দু'জন বাবা-মার কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নিই। এইরকমই একটা সুযোগ খুঁজছিল টুবু। সেই সুযোগ আসাতে সে ছুটে যায় সুধার কাছে। সুধার হাত ধরে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নেয়। জ্যোতির্ময় আত্মগত খুশির সুরে বলেন, বেশ-বেশ আমি খুশি হয়েছি, একটা কথা দিতে হবে। তুমি যে সরলতা ও নিষ্ঠা নিয়ে বড়ো হয়েছো, চিরদিন যেন তোমার বিনম্র অনুরাগ সকলের প্রতি বজায় থাকে।

---থাকবে বাবা, আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি এই পরিবারের মান-সম্মান, সমৃদ্ধি রক্ষা করবো। এতবড়ো পৃথিবীতে একমাত্র ঠাকুমা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমাকে আপনারা আপন করে নিলেন,এই আমার পরম প্রাপ্তি।

আঁধার মেঘ কেট গেল কি? অনুপ্রভা উঠে দাঁড়ালেন। চোখটা বাঁকিয়ে সুধাকে দেখে নিয়ে অনুযোগের সুরে বললেন, সবাইকে তো দেখছি বাবাঅন্ত প্রাণ, মা'কে কেউ ভালোবাসে না।

এস্তে সুধাময় মায়ের পা জড়িয়ে ধরে বলে—মা আপনার এই ছেলেকে আপনি ক্ষমা করবেন না?

—কেন করবো?

—মা !

—কোনো ছেলে মা'কে কী আপনি-আজ্ঞে করে?

—মা—

আপ্লুত খুশির মেজাজে হেসে ওঠেন সবাই।

অনুপ্রভা সুধাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, আমার বউমাটি কোথায় ঠিক করেছ, খুলে বল তো সব।

আবার থমকে যায় সুধাময়। অসহায় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায় ঈশিতার দিকে। ঈশিতা যেন জানতোই—সুধাময় তার সম্মতি চাইবে। তাই মোলায়েম সুরে বলে—তুমি সবটা খুলে বলো সুধা। মনোময় বলে, মা আমি চেঞ্জ করতে নিজের ঘরে যাই?

---না, আর একটু বোস,সুধার বলা হোক—তারপর যাস্।

সুধা বলতে শুরু করে—মেয়েটির নাম তমসা। বছর ছাব্বিশ বয়স। দেখতে অপরূপ সুন্দরী। গায়ের রং ধবধবে ফরসা নয়—ফরসায় গোলাপি আভা। টিকালো নাক, ।পাতলা টিয়া রঙের ঠোঁট। মাথাভর্তি ঘনকালো লম্বা চুল। মেয়েটির মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন পৃথিবীতে কেউ নেই। হোমে মানুষ। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াশোনা। ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতক। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ব্লক আধিকারিক। কথাগুলো একদমে মুখস্থের মতো বলে থামলো সুধাময়। ঘরে আবার অখণ্ড নীরবতা। পাশের কোনো ফ্ল্যাট থেকে ভাটিয়ালি সুর ভেসে আসছে— ''কোন্ দ্যাশে যাওগো বন্ধু / ভাটি গাঙ্ বাইয়া....'' কিছুক্ষণ পর নীরবতা কাটলে অনুপ্রভা প্রশ্ন তোলেন।

—তাহলে আমাকে দেখতে যেতে হবে কেন?

—না-মা, সুধা উত্তর দেয়, তমসা বিনম্র সুরে বলেছে, মা যদি অনুমতি করেন আমি নিজে গিয়েই মাকে প্রণাম করতে চাই।

—এক্সসেলেন্ট। আই অ্যাম ভেরি মাচ ইমপ্রেশড্। উচ্ছ্বসিত ঈশিতা হাততালি দিয়ে বলে ওঠে। আচ্ছা সুধা, তুমি তমসার রূপের বর্ণনা এমন নিঁখুতভাবে কী করে দিলে? নাকি দাদাভাই তোমাকে কায়দা করে শিখিয়ে দিয়েছে এইভাবে বলতে?

—আসলে কী বলতো, আমি তো তোমার দাদাভাইয়ের সঙ্গে বেশ কয়েকবার তমসার সঙ্গে দেখা করতে গেছি, কাজেই—

থাক থাক, আর কোনো কথা নয়। জ্যোতির্ময় এগিয়ে এসে মনো ও সুধাকে নিজের দুপাশে দাঁড় করিয়ে খুশির কণ্ঠে বলে ওঠেন। গিন্নি, তুমি আর মুখ কালো করে বসে থেকো না তোমার ছেলে-মেয়েরা যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছে, তাতে গর্বে আমার বুক ভরে গেছে। যাও অনু, আশীর্বাদের ডালা এনে বরণ করে বুকে তুলে নাও।

---নেবই তো, আমি তো এমনটাই চেয়েছিলাম। শুধু মনো আমাকে গোপন করে—

—থাক অনু, আর বিতর্ক নয়। আমার দুহাত তুলে আনন্দ করতে ইচ্ছে করছে। জান অনু, আমাদের সন্তান, মিথ্যে অহংকার ও সমাজের মিথ্যে অপকৌশল ও অন্ধবিশ্বাস ভেঙে খোলা মনের পরিচয় দিয়েছে, তুমি দেখো প্রকৃত মানুষ যারা তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেই। ওরা নিশ্চয় সুখী হবে।

—সবই তো হলো, এবারে তোমার কাজ শুরু করো। জ্যোতির্ময় থমকে যান। বলেন, আমার আবার কী কাজ?

—তোমারই আসল কাজ।

—যথা—

---এক, ম্যারাপ বাঁধা। দুই,ভিয়েন বসানো। তিন, সানাই—

—থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না। আমি বুঝে গেছি। বাবার খুশির উচ্ছলতায় সবাই প্রাণ খুলে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

জানালা পথে বাতাসে ভেসে আসে হৃদয়ের রবীন্দ্রগীতি—

''হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে.......'' ◻

রঙে রঙে রঙের উৎসব

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

রঙের উৎসব, আলোর উৎসব, ফসলের উৎসব, অবগাহনের উৎসব প্রভৃতি হিন্দুধর্মের বহুমুখী বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছে। দোলপূর্ণিমা ও হোলিখেলাকে কেন্দ্র করে সারা ভারত জুড়েই রঙের উৎসব চলে। সে উৎসবের প্রেরণা বাসন্তী-প্রকৃতির রঙের মোহনা, পুষ্পপল্লবের অনুপম সৌকর্য। প্রকৃতির রঙের অনুকরণে মানুষও সাজতে চায়, সাজাতে চায়।

'তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।।
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা, কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর— চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে।।'

'ফাগুনে আগুন/চৈতে মাটি/বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি।' গ্রামবাঙ্গলার একটি পরিচিত কৃত্য হলো বাঁশবাগানের মেঝেতে ফাগুনমাসের সন্ধ্যায় অগ্নিসংযোগ। শীতকাল থেকেই বাঁশঝাড়ের তলায় পুরু হয়ে থাকে শুকনো পাতার রাশি। বাঁশবাগানে হাঁটলে পা দেবে যায়। বড়োরা বলেন, 'ওদিকে যাসনে, চন্দ্রবোড়া সাপ থাকে।' বাঁশঝাড় ভাইপারের পছন্দের আস্তানা। গ্রামের ছেলের দল কিন্তু বাঁশবাগানে খেলে বেড়ায়। প্রতি বছর ফাগুনে আগুন জ্বালানোর বন্দোবস্ত করে সাপের চিরস্থায়ী বাসা ভাঙা হয়। বসন্ত ঋতুতে গ্রামাঞ্চলে সন্ধ্যা নামলেই দাউদাউ জ্বলে ওঠে এক একটি বাঁশবাগান। গাঁয়ের মানুষ বলেন, বাঁশঝাড়ে পটাশ সারের চাহিদা নাকি এতে মেটে! বাঁশ পটাশ-প্রিয় গাছ। অযত্নে লালিত ঝাড়ে পটাশের সেই চাহিদা মেটাবে কে? ওই ইকোসিস্টেমে বর্ষাকালে পাতা পচে আপনা থেকেই সার হয়। আর বসন্তে পাতা পুড়িয়ে দিলে সারের জোগান বাড়ে। তারপর এক কোদাল, দুই কোদাল আশেপাশের মাটি তুলে দেওয়া হয় ছাইয়ের উপরে, বাঁশের গেঁড়োর গোড়ায়। দেখতে দেখতে তাগড়াই হয়ে ওঠে বর্ষার জলে। এটা বাগানিদের দীর্ঘদিনের লোকজ্ঞান। খনার বচনে এভাবেই বাঁশঝাড় পরিচর্যার কথা আছে।

পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশের হিন্দুপ্রধান কোনো কোনো এলাকায় দোলপূর্ণিমার আগের দিন হিন্দু কিশোর-কিশোরীরা চাঁচর বা বুড়ির ঘর পোড়ায়। সম্ভবত এ এক প্রাচীন সান্ধ্য-কৃত্যের ধারাবাহিকতা। হোলিকাসুর বধেরও আগে এর শুরু। আজ এ বাগান, কাল সে বাগান পোড়ে গ্রামবাঙ্গলায়। কিছু কঞ্চি-বাঁশ হয়তো পুড়ে যায়, গৃহস্থও সজাগ থাকেন। আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজনে পুকুরের জল ব্যবহার হয়।

ছোটোবেলায় দোলের আগের দিন নেড়াপোড়া করতাম, কোথাও একে 'চাঁচর' বলে। কোথাও 'বুড়ির ঘর' পোড়ানো। পাড়ার দিদা- ঠাকুমাদের চোখে জল আসে সেদিন। অনেকেই পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। তাদের চোখের সামনেই খড়ের বাড়ি, দরমার বেড়া, শোওয়ার ঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে এক একটি বীভৎস আক্রমণে। বিগতযৌবনা ছিন্নমূল উদ্বাস্তু

রমণীরা আরও একপ্রস্ত কেঁদে নেন লুকিয়ে। জানি না, এর কোনো ফাইল প্রকাশিত হবে কিনা! তবে এটা জানি, ছোটোরা বাঁশপাতা আর কঞ্চি সাজিয়ে দারুণ 'বুড়ির ঘর' তৈরি করে। দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় শুকনো নারকেলের পাতা, সুপারির খোলপাতা, আম-জাম-পেয়ারা পাতার স্তূপ, শুকনো কচুরিপানার ভাঁড়ার। নেড়াপোড়ার বহ্নিসজ্জা রীতিমতো পাহারা দিয়ে রাখতে হতো আমাদের। এই পাহারা দুর্বলচিত্তের কাজ নয়। পাড়ার দুষ্টছেলের কাজই ছিল চুরি করে অন্যের 'বুড়ির ঘর' জ্বালিয়ে দেওয়া। কোনো কোনো জায়গায় এই চুরির নাম 'যওন-জ্বালি'। এই 'যওন' কথাটি কী থেকে এসেছে ভাষাবিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন। অনেক সময় জোর করে চাঁচর জ্বালানো নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় অশান্তি হতো।

চাঁচর জ্বলছে। ক্যাম্প-ফায়ারের মতো তার চারপাশে গোল হয়ে আয়োজকেরা দাঁড়িয়ে আছি। পূর্ণিমার চাঁদ আরও উজ্জ্বল, আরও মোহময় হয়ে উঠছে। হাততালি দিয়ে ছড়া কাটছি, 'আজ আমাদের নেড়াপোড়া/কাল আমাদের দোল/পূর্ণিমার ওই চাঁদ উঠছে/বলো হরি বোল।' সমবেত কণ্ঠে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আবারও বলি 'হরি বোল। হরি বোল।' হরিনামের মাধুর্যে কিশোর-কিশোরীর অন্তঃকরণ তখন আবেগে উদ্বেল। আগুনের আলো, পুবে পূর্ণশশী--- এক অসামান্য পরিবেশ! পরের দিন দোল। খেলার আয়োজন নিয়ে তাই আমরা মশগুল হই। আরেকপ্রস্ত আলোচনা চলে।

আজকাল ভেষজ আবির নিয়ে হইচই হলেও, চার দশক আগে আমরা ছোটোরা বাড়িতে ভেষজ আবির বানিয়েছি কত। অভাবের সংসারে ওটুকু রং-আবির সংগ্রহ করা তখন কঠিন হয়ে পড়তো। সরস্বতী পূজায় কাঁচা হলুদ, নিম, ভেজানো মুসুরি বাটা তেল মিশিয়ে সারা গায়ে মেখে স্নান করতে যেতাম। তখনই আইডিয়া হলো, হলুদ-বাটা বেশ মানানসই রং। বেটে নিতাম শ্বেত আর রক্ত চন্দন, ওগুলি সুগন্ধি। নানান রঙের গাঁদার পাপড়ি, নীলকণ্ঠ ফুল, অতসী, কল্কের পাপড়ি বেটে নিতাম। পাপড়ির মণ্ডে আঠালোভাব আনতে তরিতরকারির খোসার আঠা মিশিয়ে দিতাম। যেমন ঝিঙে, পটোল, লাউ, শশা ইত্যাদির বোঁটার দিকটি কেটে নিলেই আঠা বেরিয়ে আসতো। আমরা চামচ দিয়ে চেঁচে নিতাম। একটি থালার মাঝে রেকাবিতে রাখা থাকতো সামান্য আবির। বাকি ছোটো গোল বাটিতে উদ্ভিদ-মণ্ড সাজিয়ে নিয়ে দোল খেলতে বেরোতাম। দুষ্ট ছেলেরা হাসে। পাড়ার দিদিরা নিজেরাই এসে মেখে নেয় ভেষজ আবির, চট করে পাওয়া যেতো না তখন। আর আমাদেরও দিদিরা বেশ করে মাখিয়ে দিতেন। 'এই তো, রূপচর্চা হয়ে গেল। এরপর যা বাঁদর রং খেলা হবে, তা এই মণ্ডের উপরেই পড়বে। চামড়ার ক্ষতি হবে না কোনো।' রঙের উৎসবে, দোল-হোলির দিন আমরা সবাই কি প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারি না?

নেড়াপোড়া হওয়ার আগে আমরা বালতি করে জল রেডি রাখতাম। শেষে বাঁশ পিটিয়ে, জল দিয়ে আগুন নিবিয়ে দিতে হতো। আর খোঁজা হতো মাটির হাঁড়িতে রাখা আলু-রাঙাআলু-কচু-খামালু। ওসব খোসা ছাড়িয়ে সৈন্ধবলবণ, লঙ্কা আর সরষের তেলে মেখে সকলে মিলে খাওয়া হতো। পরদিন পাড়ার গরিব মানুষেরা ন্যাড়াপোড়ার জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে আসতেন কাঠকয়লা। রঙ ফুরিয়ে গেলে কালি-ভূষো বানানোর জন্য ছাই সংগ্রহ করতাম।

এক সময় ফাল্গুনী পূর্ণিমার তিথিতে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হতো। দোলযাত্রা ছিল তার ধারক ও বাহক। ফাল্গুনী পূর্ণিমার পর চৈত্র মাসকে প্রথম মাস ধরে বারোমাসের হিসেব হতো। আর ওই যে জনজাতিদের 'বাহা পরব', ওটাও নববর্ষ ধারণা, নব বসন্তের পুষ্প পরিণতি। তা অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুনী পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়ে। বসন্ত-বন্দনার মাধ্যমে নববর্ষের সূচনা জনজাতি কৌমসমাজের প্রাচীন রীতি। ফুলের পরবে পুষ্পোপাসনার মধ্যে আগামীদিনের খাদ্যের প্রতিশ্রুতি। কারণ ফুল থেকে আসবে ফল। 'ফুল কহে ফুকারিয়া, ফল, ওরে ফল, /কতদূরে রয়েছিস বল মোরে বল।/ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি,/তোমার অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি।' এই যে রূপান্তরের নান্দনিকতা, এটাই খাদ্য-সংস্কৃতি। বাহা পরবে তাই শস্য পাবার আকাঙ্ক্ষা এবং তারই প্রেক্ষিতে নববর্ষকে আহ্বান। প্রকৃতির রং-রূপ পুষ্প-পল্লব হয়ে ধরা দেয় দোলপূর্ণিমায়, তারপর ফল হয়ে, বীজ হয়ে দেবী অন্নপূর্ণার প্রসাদ রূপে প্রাপ্ত খাদ্য আমাদের বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

কয়েক দশক ধরে উত্তর ২৪ পরগনায় দোল উৎসব দেখেছি। সাতের দশকে দোল উপলক্ষ্যে যথেষ্ট অসভ্যতা হতো। সমবেতভাবে কাউকে কাউকে চ্যাংদোলা করে নর্দমায়, এঁদো পুকুরে ফেলে দেওয়া হতো। আশির দশকে এইসব অনেকটা কমলো। তখন আবির দিয়ে খেলা যথেষ্ট হতো। বাচ্চারা পিচকারি ব্যবহার করতো। আবির ফুরোলে বাঁদর রং, সোনালি/রুপালি রং পকেটে নিয়ে ঘুরতো কিশোর-তরুণরা। ওইসব রং মাখালে কারও মুখ আর চেনার জায়গায় থাকতো না। রং তুলতে খুব সাধ্যসাধনা করতে হতো। পুকুর ঘাটগুলি দুপুর একটার পর থেকে রং তোলার স্নানার্থীতে ভরে যেত। নব্বইয়ের দশকে বাচ্চারা বেলুনে ভরা রং ব্যবহার করতে শুরু করে দিল। পিচকারির ব্যবহার শুরু হলো বেলুনে রং-গোলা জল ভরতে। এখনকার বিষাক্ত রংগুলি গায়ে লাগলে জ্বলে যায়। কে শোনে কার কথা! ওই রং মাখতেই হবে?

জানাই, আমার বাড়িতে কী ঘটতো দোলের দিন। ক্লাস এইটের আগে বাবা জীবিত থাকাকালীন তিনি দোলের আগের দিন বাড়িতে এনে দিতেন মাটির ছোটো রাধাকৃষ্ণ, তিন রঙের আবির, কিছু ফুল-মালা, সঙ্গে বাতাসা, ফুট কড়াই, মঠমিষ্টি। বাড়িতে তৈরি হতো মালপোয়া, পায়েস। দোলের দিন সকালে পুজো হতো। বাবা নিজে করতেন পূজা। পূজার পর মাটির রাধাকৃষ্ণের পায়ে আবির দিয়ে তারপর বয়স অনুযায়ী বাবা-মা, দাদা-দিদিদের পায়ে আবির দিতাম। বোনের কপালে দিতাম আবিরের টিপ। বাবা-মা আশীর্বাদ করে কপালে আবির দিতেন। বাবা কখনো কেমিক্যাল রং কিনে দিতেন না। আবিরেই খেলতাম। সুগন্ধি ছিল সেই আবির। বাড়িতে ছোড়দি শ্বেতচন্দন আর রক্তচন্দন বেটে রাখতেন। চন্দনপাটায় বাসন্তী আর কমলা গাঁদাফুল বেটে নেওয়া হতো। দিদিরা এসব আমাদের মুখে ভালো করে মাখিয়ে দিতেন যাতে কেমিক্যাল রং বাইরের কেউ মাখালেও ত্বকের ক্ষতি না হয়। তারপর আমরা সকলে ছুটে চলে যেতাম বাইরে রং খেলতে।

সকাল ন'টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত রং খেলতাম। অনেক বাড়িতে কাকিমা-জেঠিমার পায়ে আবির দিলে তারা মুখে মিষ্টি আর জল ঢেলে দিতেন আলতো করে। নব্বইয়ের দশক থেকে এসব প্রায় উঠে গেল। এখন ফ্ল্যাট কালচারে সবাই সবার সঙ্গে মেশেন না। এই দূরত্ব ভাঙা দরকার। মনে আছে আমাদের

ছোটোবেলায় বন্ধুদের মধ্যে আড়ি-ভাব ছিল। দোলের দিন সে সব দূর হয়ে যেত, সবার সঙ্গে তখন সদ্ভাব। দোল আমাদের কথা না বলার অভিমান দূর করতো।

ভেষজ আবির আমরা নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারি। চীনা রং ব্যবহার করা একদমই উচিত নয়। দোল ও হোলি বসন্তের উৎসব, প্রকৃতি-কেন্দ্রিক আনন্দ-পারম্পর্য। এই দিনগুলিতে প্রকৃতির মধ্যেই থাকা উচিত; প্রাণে ও মনে প্রকৃতির আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করা উচিত। কৃত্রিম, ক্ষতিকর রং ব্যবহার করে উৎসবকে কলুষিত করার নয়। প্রাকৃতিক ভেষজ রং ব্যবহার করে নিরাপদে দোল ও হোলি খেলতে চাই আমরা। বাড়িতে নিজেই তৈরি করে নিতে পারি টাটকা জলরং আর আবির। বাচ্চাদের হাতে সেটাই তুলে দিতে হবে, আর উৎসবের পুরো আনন্দ উপভোগ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা প্রকৃতির এক অনির্বচনীয় আনন্দের সাগর। প্রকৃতিরূপী নারী চেতনার রং দিয়ে পুরুষোত্তম্ শ্রীকৃষ্ণের মন রাঙানোর প্রচেষ্টা করেন। বসন্তী পুষ্পরেণুতে সেজে ওঠে প্রকৃতি, তার কিশলয়, তার নতুন কুঁড়ি। প্রকৃতির রং কখন যেন আমাদের মন রাঙিয়ে দেয়, আমরা হয়ে যাই রাধাকৃষ্ণের ঐশী প্রকাশ। মানব মনে ঈশ্বর এসে ধরা দেন রঙের দ্যোতনায়। তাই প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে, প্রকৃতির আবির গুলাল নিয়ে খেলতে চাই বসন্ত-দোল। দুলিয়ে নিতে চাই নিজের মন, কৃত্রিম রঙের হোলিকাসুরকে পরাজিত করতে চাই।

কীভাবে তৈরি করবো প্রাকৃতিক ভেষজ রং?

১. লাল-মাটির মাঠে মাঠে এখন পলাশ ফুটে লালে লাল; পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূমের জঙ্গলে জঙ্গলে পলাশ ফুলে বিছিয়ে আছে মাটি। তা কুড়িয়ে সংগ্রহ করে নিন, শুকনো অথবা সতেজ। দক্ষিণবঙ্গের নানা স্থানে পথিপার্শ্বস্থ পলাশ ফুলেও আগুন জ্বলছে! পলাশ পাপড়িগুলিকে বৃন্ত থেকে আলাদা করতে হবে। তারপর সেই পাপড়ি পরিমাণ মতো গরম জলে সেদ্ধ করতে হবে। সেদ্ধ হলে পাপড়ি থেকে সম্পূর্ণ পলাশ রং বেরিয়ে আসবে। তখন ওই রঙিন জলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্যালকম পাউডার মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে নিলেই পলাশ ফুল থেকে ভেষজ আবির তৈরি হয়ে যাবে। প্যাকেটে ভরার আগে ওই আবিরে রং ধরে রাখার জন্য কিছু পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো মেশানো যায়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গাঁয়ের মানুষ তা তৈরি করে বিপণন করতে পারেন স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে। পলাশ ফুল কুড়িয়ে আপনি নিজেও বাড়ির জন্য রং তৈরি করে নিতে পারেন। তরল রং ধাতব পিচকারিতে ভরে বা অন্য উপায়ে মাখিয়ে দিন প্রিয়জনকে। সে রং কখন লাগবে এসে মনে, জানা নেই!

২. একইভাবে পূজা হয়ে গেলে নীলকণ্ঠ অপরাজিতার ফুল-মালা থেকে পাপড়ি আলাদা করে নিন। সরাসরি ফুল কিনেও নিতে পারেন বাজার থেকে। গরম জলে নীল অপরাজিতা সেদ্ধ করলে নীল রং বের হয়ে আসে।

৩. বাসন্তী ও কমলা রঙের আলাদা আলাদা গাঁদা ফুলের জাত রয়েছে, কিনে আনুন। বাড়ির প্রয়োজনে পূজা হয়ে যাওয়া ফুল ব্যবহার করতে পারেন। পাপড়ি গরম জলে সেদ্ধ করে তাতে ট্যালকম পাউডার মিলিয়ে, ভালোভাবে গুলিয়ে, রোদে শুকিয়ে যথাক্রমে হলুদ ও কমলা আবির তৈরি করুন।

৪. কাঁচা হলুদ সিদ্ধ করে অথবা গুড়ো হলুদ গরম জলে মিশিয়ে প্রাকৃতিক রং তৈরি করা যায়। রঙে সুগন্ধি আনতে তাতে তুলসীপাতা, তেজপাতা সেদ্ধ জল মেশান। রং তৈরি হলে আলাদা করে সামান্য কর্পূর মিশিয়ে দিন। অন্য ক্ষেত্রেও নানান প্রজাতির তুলসী, তেজপাতা, কর্পূর ব্যবহার করলে সুগন্ধ পাওয়া যাবে।

৫. সবুজ রং তৈরি করতে পূর্ণ বিকশিত বেলপাতা শুকিয়ে (ঘরোয়া শিল্প করতে ডেসিকেটরে বেলপাতা শুকাতে হবে) তা গুঁড়ো করে নিন, তা সূক্ষ্ম চালুনিতে ছেঁকে মিশিয়ে দিন ট্যালকম পাউডার, সবুজ আবির রেডি!

অদ্ভুত আলো

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নাম কলানবগ্রাম। গ্রামটির চারিধারে বাঁশঝাড়। একটি বাঁশঝাড়ের মাঝখানে একটি বড়ো মাপের জলাশয়। শীত-গ্রীষ্মে হেজেমজে থাকলেও ভরা বর্ষায় তা যেন এক ভীষণ রূপ ধারণ করে। প্রচুর মাছও ভেসে বেরিয়ে যায়। বাঁশঝাড়ের মধ্যেই আছে একটি জায়গা। নাম— মামদোতলা। ভূতেদের রাজা মামদো, তাঁর নাম অনুসারেই হয়তো এই স্থানের নামকরণ। গ্রামের দু'দিকে ধানের জমি, শীতকালে আলু চাষ। কোথাও সবজি খেত, কোথাও শশা খেত। যত দূর চোখ যায়, খালি সবুজ আর সবুজ। চাষের জমির মাঝে আলে দাঁড়িয়ে দূরদূরান্তে দেখা যায় তাল-নারকেলের সারি।

চাষের জমির বুক চিরে চলে গেছে একটি খাল। স্থানীয় লোক বলে বেহুলার খাল। মনসামঙ্গলের যুগে হয়তো কলার ভেলা ভাসিয়ে এই পথেই স্বামী লখিন্দরের দেহ নিয়ে অনির্দেশের পথে যাত্রী হয়েছিলেন মানবজন্মলাভ করা স্বর্গভ্রষ্টা দেবী বেহুলা। খালের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে শীতকালে ভিড় করে কত নাম না জানা পরিযায়ী পাখি। দেশ তাদের রাশিয়া, সাইবেরিয়া, ইউরেশিয়া পূর্ব ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকা। শীতের দিনে কলকাতা থেকে ভিড় জমে প্রকৃতিপ্রেমীদের। তাদের অনেকে পক্ষীবিশারদ। ক্যামেরার লেন্সে লেন্সে চলে ঠোকাঠুকি। পিনটেল, স্নাইপ, গাডওয়াল— বিভিন্ন পাখির এই নাম শোনা যায় তাদের মুখ থেকে। খালের জলে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হয় পদ্ম ও জলসিঙ্গারার চাষ। খালের দু'প্রান্তে দেখা যায় কাশফুলের সারি। খালের জলেই হয় পাশের জমিগুলির জলসেচ।

খাল যেখানে নদীতে মিশছে সেখানে অজস্র ঝোপঝাড়। যেন এক গভীর জঙ্গল। সেদিকে আছে জনজাতিদের গ্রাম। পূর্ণিমার রাতগুলিতে সেদিক থেকে ভেসে আসে দ্রিমি দ্রিমি ধামসা মাদলের শব্দ। নৈঃশব্দের রাত কেটে ভোর হওয়া অব্দি চিরহরিৎ কলানবগ্রাম জুড়ে বিরাজ করে প্রকৃতি আর অরণ্যানীর এক অতীন্দ্রিয়, শ্যামলী ছায়া। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তের ধানখেতের দিকেই এক কোণে মা ওলাই চণ্ডী, মা বসন চণ্ডীর থান। গ্রামের মানুষদের বিশ্বাসে জাগ্রত একটি থান। ভক্তিভরে মানসিক বা মানত করলে মা শোনেন, ভরিয়ে দেন ভক্তদের, পূরণ হয় সব প্রার্থনা ও মনোবাঞ্ছা।

অভিনব ক্লাস এইটে পড়ে বঁড়শূল ব্লকের হাইস্কুলে। পড়াশোনায় মন আছে তার বেশ। বাড়ি কলানবগ্রামে। বাবা-কাকারা সম্পন্ন কৃষক। মনে মনে বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখে সে। স্কুলের জনপ্রিয় বিজ্ঞান শিক্ষক হলেন মৃত্যুঞ্জয় স্যার। স্যার তাদের কোচিংও পড়ান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, অঙ্ক, এমনকী ইতিহাস-ভূগোলেও তিনি পারদর্শী। ছাত্রদের মধ্যে মননশীল চিন্তা, যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাভাবনা গড়ে তুলতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভালো কবিতাও লেখেন। অভিনব তাঁর খুব প্রিয় ছাত্র।

গ্রামে জন্ম, সেখানেই বেড়ে ওঠা। অভিনব ছোটোবেলা থেকেই বেশ সাহসী। জমিতে চাষের কাজ চলার সময় আলকেউটে বেরিয়ে আসে জানতে পেরে তার ইচ্ছে হয় আলকেউটে দেখবে। কখনও ঝোপে ঝাড়ে খুঁজে বেড়ায় কাঁকড়াবিছে, তেঁতুলবিছে বা মাকড়সার ডেরা। বিভিন্ন পোকামাকড় সংগ্রহ করে বেড়ায়। মৃত্যুঞ্জয় স্যার সিলেবাসের পড়াশোনার ফাঁকে মাঝে মাঝে শিখিয়ে দেন বিভিন্ন ছোটো ছোটো প্রাণীর কালেকশন, প্রিজার্ভেশন, আইডেন্টিফিকেশনের পদ্ধতি। তারপর ট্যাক্সোনমি বা শ্রেণীবিন্যাসের প্রক্রিয়ায়, শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রজাতি স্তর পর্যন্ত সেই প্রাণীর পরিচয় ও বিজ্ঞানসম্মত নাম। রবিবার স্কুল ছুটির দিনে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর ছাত্রদের একত্রিত করে ব্লকের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়ে পড়েন। বিভিন্ন গাছপালা, অনাদরে প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা নানা উদ্ভিদ, বেহুলার জলে ভাসতে থাকা অ্যাকোয়াটিক টেরিডোফাইট — এইসবের নামধাম চিনিয়ে দেয়। কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, বনবিড়াল, নানা প্রজাতির সাপ ও ব্যাং, গোসাপ, কচ্ছপ, পিঁপড়ের নানা প্রজাতি, উইপোকার ঢিবি, মৌচাক, বাবুইয়ের বাসা, হরিয়াল পায়রা, বিভিন্ন রং-বেরঙের প্রজাপতি, মথ, ঝিঁঝিপোকা, পঙ্গপালের বিষয়েও বুঝিয়ে দেন ছাত্রদের। এই গ্রাম্য এক্সকারশনের নাম তিনি দিয়েছেন— 'প্রকৃতি পরিক্রমা'।

ইউটিউবে একদিন ব্যান্ডের একটা গান শুনলো অভিনব। 'সেই যে হলুদ পাখি, বসে জামরুল গাছের ডালে — ফিরবে না সে কী ফিরবে না, ফিরবে না আর কোনো দিন'। স্যারকে একদিন জিজ্ঞেস করলো এরকম কোনো পাখি আদৌ আছে কী না। শুনে স্যার হাসলেন, কিছু বললেন না। একদিন রবিবার প্রকৃতি পরিচয় করাতে করাতে স্যার একটা বাইনোকুলারে চোখ রেখে যেন আবেগবিহ্বল হয়ে পড়লেন। বললেন অভিনব কোথায় গেলি রে? অভিনব কাছে এলে বললেন লেন্সে চোখ রেখে এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখ। অভিনব দেখলো অনেক দূরের একটি গাছের ডালে সত্যিই বসে আছে একটি হলুদ পাখি। ঠিক সেই মায়াবী গানটার মতোই। স্যার বললেন এই পাখিটার নাম— গোল্ডেন ওরিওল। এই পাখিটাই উড়ে গিয়েছিল, এখন ফিরে এল হয়তো।

গ্রামের ছেলে হলেও ভূতের ভয়ডর ছিল না অভিনবর। ওর এক বন্ধু কৌশিক অমাবস্যার রাতে মামদোতলার

দিকটায় বাঁশঝাড়ে যেতে বারণ করত। ওর মা-কাকিমারা বলেছেন যে ওই দিকটা নাকি নিশির আড্ডাখানা। ওখানে নাকি শ্যাওড়াগাছও আছে। অভিনবর বাড়িতেও এই ধরনের কথাবার্তা অনেকেই বলে থাকেন। বাড়ির ছোটোদের প্রতি অলিখিত সতর্কতাও জারি থাকে সারা বছর। অভিনবর ছোটো বোন রাতের দিকে ঠাকুমার কোলে বসে ভূতের গল্প শুনে ভয় পায় বেশ। অভিনবর মনে তাই প্রশ্ন ভিড় করে আসে। ভূত বা অপদেবতা যে কী সেটা তাকে জানতেই হবে। জানতে না পারলেও তাকে একবার অন্তত দেখতেই হবে। নদীর একটা দিকে আছে একটা শ্মশান। সেখানে আগে লোক মরে গেলে দাহ করা হতো। বিকেল হয়ে সন্ধ্যে গড়ালেই জায়গাটা এতো গা ছমছমে যে লোকজন চিতায় মৃতদেহ তুলে দিয়েই পালিয়ে আসত। নদীর তীরে সেই শ্মশানে রাত বাড়লে শোনা যেত অদ্ভুত সব শব্দ আর শিশুর কান্নার শব্দ।

এক অমাবস্যার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে লুকিয়ে বাঁশঝাড়ে গেল অভিনব। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই। কিন্তু তারাগুলো যেন টর্চ জ্বেলে আছে। স্যারের শেখানো চেনা কোনো কনস্টেলেশন (নক্ষত্রপুঞ্জ) আছে কিনা দেখতে দেখতে যেন কেটে গেল অনেকটা সময়। হাতে ঘড়ি ছিল না। হঠাৎ পুকুরের জলের দিকটা মনে হলো যেন একটা আলো। আলোটা যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর যেন বাঁশঝাড়ের মধ্যেই নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। কখনও এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, পরক্ষণেই সেখান থেকে নিভে গিয়ে কয়েক হাত দূরে ফের জ্বলে উঠছে। দেখে চোখ ছানাবড়া অভিনবর! কৌশিক ঠিক বলে তাহলে! ও মিথ্যাবাদী নয়। তাহলে এই ভৌতিক আলোর হাতেই কি ওর মৃত্যু নিশ্চিত? জোরে জোরে কীসের যেন শব্দ পায় অভিনব। আসলে ওটা ওর হার্টবিট। ঠাকুমার কথা মনে করে সে। ঠাকুমা বোনুকে বলে নিশি তোমাকে তার দিকে টানার চেষ্টা করবে, তুমি তার আলো দেখে তাকে ছুঁতে, তার সন্ধানে সেই আলোর পিছনে ধাওয়া করবে। তারপর তোমায় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিশি তোমায় টেনে নিয়ে গায়েব হয়ে যাবে। আর কিছু না ভেবে বাড়ির দিকে দৌড় দিল অভিনব।

পরদিন ক্লাসে অভিনবকে না দেখে অবাক হলেন মৃত্যুঞ্জয় স্যার। ছেলেটা আসেনি কেন? ওর পাশের বাড়ির কৌশিককে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। কৌশিক বলল ওর কাল থেকে খুব জ্বর স্যার। তাই আসতে পারেনি। খবরটা শুনে মৃত্যুঞ্জয় স্যারের মনটা যেন ভারাক্রান্ত হলো। প্রতি বছর প্রতিটি ব্যাচের কত ছাত্রের সঙ্গেই দিনগুলো কাটে। কিন্তু এই ছেলেটি যেন একটু অন্যরকম। বিকেলে কোচিঙেও এলো না অভিনব। দুটো দিন এভাবে কাটার পর তৃতীয় দিন স্কুলের শেষে অভিনবকে ফোন করলেন মৃত্যুঞ্জয় স্যার। প্রথমে বেজে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার ওর মা ফোন ধরলেন। ওর মায়ের থেকে অভিনবর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন। তারপর মাকে বললেন অভিনবকে ফোনটা দিতে। ধমকের সুরে ছাত্রকে বললেন স্কুলে আসা বন্ধ, কোচিঙেও আসছ না, কী ব্যাপার তোমার? ভয়ার্ত গলায় অভিনব উত্তর দিল, স্যার ,আমায় ক্ষমা করবেন, বাড়ি থেকে বেরোতে খুব ভয় পাচ্ছি স্যার। বিছানা থেকে উঠতে পারিনি দু'দিন। মৃত্যুঞ্জয় স্যার অবাক হলেন। ছেলেটার হলো কী! পরদিন স্কুল ছুটির পর কৌশিকের সঙ্গে নিজের সাইকেল চেপে গেলেন অভিনবর বাড়ি। বাড়িতে ঢুকে দেখা হলো অভিনবর মায়ের সঙ্গে। গেলেন অভিনবর ঘরে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন শুয়ে থাকা ছাত্রের। হাতটা চেপে ধরে ওর পালস্টা অনুভব করতে গিয়ে চোখ খুলল অভিনব। বললো স্যার আপনি এসেছেন? রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন মৃত্যুঞ্জয় স্যার। বললেন শরীর খারাপ হলো কী করে? অভিনব চুপ। তারপর ধীরে ধীরে মনে জোর এনে স্যারকে বললো সব। আর বললো বাবা-মাকে বলে দেবেন না স্যার।

অমাবস্যার রাতের সেই বর্ণনা শুনে হেসে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয় স্যার। বললেন, দূর বোকা। ওটা ভৌতিক আলো হতে যাবে কেন? ওটা কোনো ভূত নয়, নিশিও নয়। এখন ফাল্গুনের শেষ। এইসময় ওই জলাশয়টা শুকিয়ে জায়গাটা সোয়াম্প, ড্যাম্প বা মার্শি ল্যান্ড হয়ে আছে। ওইখানে বাঁশপাতা পচে, অন্যান্য ডেট্রিটাস আর্দ্র মাটির মধ্যে ডিগ্রেডেড, ডিকম্পোজড্ হয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি হয় মার্শ গ্যাস বা মিথেন। তার সঙ্গে ফসফিন যোগ হলেই জ্বলে উঠবে আলো। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সৃষ্টি এই আলো বা আলেয়া কিন্তু ক্ষণিকের। কয়লাখনির মধ্যেও পাওয়া যায় এই মিথেন গ্যাস। ফসফিন হলো ফসফরাস ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগ, একটি বর্ণহীন, দাহ্য গ্যাস। গুজরাটের কাথিয়াওয়াড় ও কচ্ছের জলাভূমি এলাকায় এই আলোকে ছেঁড়বাতি বলা হয়, ইউরোপের সামুদ্রিক নাবিকদের ভাষায়— উইল-ও'-দ্য-উইসপ্। তবে ঠাকুমা একটা কথা কিন্তু ঠিক বলেছেন, এই আলোকে তাড়া করে কিন্তু কোনো লাভ নেই। কারণ তা হবে পণ্ডশ্রম।

স্যারের কথা শুনেও যেন ঘোর কাটে না অভিনবর। স্যারকে বলে তবে যে পাড়ার সবাই বলে শ্মশানের ভূতের কথা। ওখানে নাকি হি হি আওয়াজ, বাচ্চাদের কান্নার শব্দ পাওয়া যায় স্যার। মৃত্যুঞ্জয় স্যার বলেন, বোকা স্টুডেন্ট আমার, এতো ভীতু হলে হবে? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে হবে তো বাবা। তোমরা বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠো, এটাই তো আমরা চাই। ওখানে অনেক ডেডবডি আনবার্ন্ট বা আধপোড়া থাকে। তার যদি কোনো লোয়ার লিম্ব বোন বা পায়ের হাড় যদি ওপেন এয়ারে এক্সপোজড্ থাকে, সেই হাড়ের ডায়াফাইসিস, ফিমার, টিবিয়া, ফিবিউলা অংশগুলিতে ফোরামিনা বা ফোরামেন নামক যে এনক্লোজড্ গ্যাপ বা ফাঁকগুলি থাকে, সেই ফুটোগুলির মধ্য দিয়ে gentle breeze বা মৃদুমন্দ হাওয়া-বাতাস চলাচল করলে বাঁশির মতো আওয়াজ তো হওয়া স্বাভাবিক। আর শিয়াল বা হায়েনার বাচ্চা যদি কখনও ডেকে ওঠে, তবে তা অবিকল মানবশিশুর কান্নার মতোই শোনায়। তাই এগুলো কোনোটাই অলৌকিক নয়। সব কিছুই প্রাকৃতিক। অপ্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে মনে স্থান দেবে না একদম। এই প্রকৃতি থেকেই আমাদের উদ্ভব এবং এই প্রকৃতিতেই একদিন মিলিয়ে যাবো আমরা। কোনো পরিস্থিতিতেই ভয় পাবে না একদম।

পরদিন ঠিক হয়ে গিয়ে স্কুলে গেল অভিনব। জীবনে সে শপথ করেছে যত কঠিন পরিস্থিতিই আসুক, ভয়কে জয় করে এগিয়ে চলবে সে। স্যার যেন চোখ খুলে দিলেন তার।

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

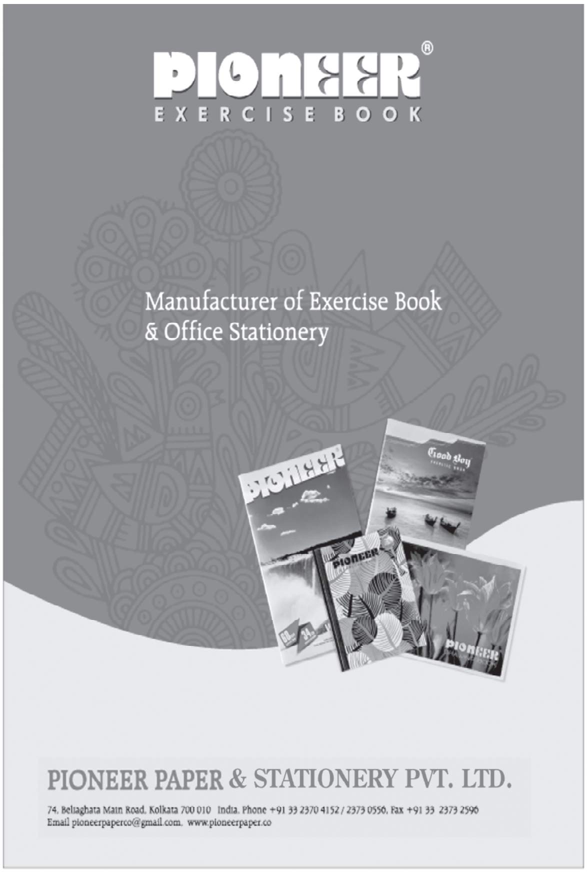

With Best Compliments from -

A

Well wisher

বশবর্তী

শেখর সেনগুপ্ত

একদিকে কাঞ্চননগর, অপর দিকে আলমগঞ্জ— এ দুয়ের মাঝে গ্রাম তেজগঞ্জ। আছে ঝোপঝাড়, কাঁচা-পাকা বাড়ি এবং ঐতিহাসিক বিদ্যাসুন্দর কালীমন্দির। নেতারা যতই কথা দিক, এলাকায় পাকা রাস্তার ব্যাপারে যতই প্রতিশ্রুতি দিক, এলাকায় পাকা রাস্তার বিস্তার সত্যিই কম। দলীয় রাজনীতির শেকড় পাকাপোক্ত। সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ডের পর এলাকা থেকে একটা মিছিল গড়াতে গড়াতে গ্রাম ছেড়ে শহরও ঘুরে এসেছে। তবে এখনও পঞ্চায়েতরাজের রমরমা, বিদ্যুৎ এলেও কয়েকটি বাড়িতে অদ্যপি তা ঢোকেনি। তাই সন্ধ্যা ঘনাতে না ঘনাতেই কিছু বাড়ি আধা-অন্ধকারে নাক উঁচিয়ে থাকে। তবে বিদ্যাসুন্দর কালীবাড়িতে মায়ের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াতে দূরাঞ্চল থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে লোকেরা আসেন কিবা দিন কিবা রাতে। ওই মন্দিরকে ঘিরেই আজও ছোটো-বড়ো ভোটের আগে রকমারি মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে আসরে মুখর হয়ে ওঠেন সকল রাজনৈতিক দলেরই স্থানীয় পাণ্ডারা।

এই তেজগঞ্জেরই উঠতি তরুণদের একজন তমাল নাগ। তমালকে চেনে না, এমন কেউ এলাকায় আছে বলে তো মনে হয় না। বসন্তের রোদ্দুর যেদিন পুরোপুরি ডানা মেলে দেয়, তমাল সেদিন ইডেনক্যানালের কাঁচা বাঁধে উঠে অনেকের সঙ্গেই যেন পাল্লা দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যায় বর্ধমান শহরের আধা গ্রাম আধা শহর কাঞ্চননগর অবধি। ছুরি-কাঁচির জন্য এলাকাটা বিখ্যাত, যদিও ছুরি-কাঁচি নির্মাণের কারখানাগুলি ক্রমেই থিতিয়ে পড়ছে। সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ডও ওই বাজারে তেমন একটা জোয়ার আনতে পারেনি। কিছু কিছু বিক্রি হলেও বিক্রেতারই হুঁশিয়ারি তাড়া করে, ‘যখন-তখন বের করবে না। সাঁইবাড়ির কাণ্ডের পর পুলিশের নজরদারি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে।...’

তমাল নাগের কাছে কাঞ্চননগরের এ রকমই একটা ছুরি রাখা আছে। ওটাকে পকেটে রেখে সে কালেভদ্রে কালীমন্দিরে যায়। মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে কী যেন বলে বিড়বিড়িয়ে। আজ অবধি কিন্তু তার পিছু পিছু কোনও পুলিশ এসে ঢোকেনি এখানে। বেকানুন মোতাবেক বড়োসড়ো কাণ্ডও তো ঘটে না কত বছর ধরে। আলাপচারিতার মাধ্যমে তমালকে আজ অবধি কেউ ফেউ বানাতে পারেনি। এর পিছনে তমালের মা বসুমতীদেবীর অবদান অনস্বীকার্য। তেজগঞ্জে কোনও হুল্লোড়বাজি মাথাচাড়া দিলেই তমালকে নানা উপায়ে ঘরের বাইরে পা ফেলতে দেন না। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্ম রাজনৈতিক দাপাদাপি, হুল্লোড়বাজি যে হারে বাড়ছে, সেখানে তমালসম যুবকরা আর কতটা নিস্পৃহ, ঘরবন্দি হয়ে থাকতে পারে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ তো থাকবেই।

সরাসরি কোনও এক দলের হয়ে পার্টিবাজি না করলেও কয়েকটি মুখ্য দলের দাদাদের নজর তমাল নাগের ওপর আগেও ছিল, এখনও আছে। এর অন্যতম কারণ তমালের বাবা স্বর্গীয় নবেন্দু নাগ। তিনি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সামান্য চাপরাশির পদে থেকেও যেভাবে মাতব্বরি করে গেছেন, সেটাকে একরকম মস্তানিই বলা চলে। তাঁর মাতব্বরির ধরন-ধারণ ছিল প্রকৃতই অসচরাচর। কো-অপারেটিভ ব্যাংকে ম্যাসেঞ্জারের পদে থেকেও এমন চোখ রাঙাতেন, যেন

ফ ঃ ৬

তিনিই ওই ব্যাংকের ছদ্মবেশী ডিরেক্টর। তাই বন্ধুর চেয়ে তার শত্রুর সংখ্যা ছিল বেশি। কিছু লিখিত অভিযোগও জমা পড়েছে তাঁর নামে। কিন্তু ইউনিয়ন পিছনে থাকায় ঘর্মাক্ত ব্রাঞ্চম্যানেজার শুধুই রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছেছেন। একটা প্রায় জীর্ণ দু'চাকা সাইকেলে চেপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিসে আসতেন; আর বিকেল পাঁচটা হতেই সেই সাইকেলেই চেপে রওনা দিতেন বাড়ির দিকে। যতক্ষণ অফিসে থাকতেন, কতরকমের ঢ্যামনামি যে ছিল তাঁর! আচমকাই পর্দা নেমে আসে তাঁর সেই দাপাদাপির ওপর। নির্মম পথদুর্ঘটনা। বর্ধমান শহরের কার্জনগেটের মধ্য দিয়ে তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে আসছিল তাঁর সাইকেল। মুখোমুখি ধাক্কা মারে পুলিশেরই একটা কালো লম্বা গাড়ি। এক ধাক্কাতেই শেষ। তারপর একদিকে বাপের অপঘাতে মৃত্যু, অন্যদিকে ব্যাংকের দুটো স্টাফ-ইউনিয়নের মধ্যে কামড়াকামড়ি... ক্ষতিপূরণস্বরূপ অনেক টাকা দিলেও ব্যাংক নিহতের ছেলেকে পাকাপাকি ভাবে একটা পদ দিয়ে উঠতে পারেনি আজ অবধি।

এবার জানাই, অতসব সুখ-দুঃখের ঘটনাই হয়তো তমাল নাগকে তড়িঘড়ি পৌঁছে দিল এক বিশেষ লেভেলে। মনে হচ্ছে, রোম্যান্টিক্যালি ছেলেটা এবার পা রাখলো এক অজানা ভুবনে। তাঁর কণ্ঠস্বরেও এসে যায় আমূল পরিবর্তন। রাজনীতির যে সমস্ত স্থানীয় নেতা এতকাল তাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতেন না, এখন তাঁরাই উদ্যোগ নিচ্ছেন ছেলেটাকে পুরোপুরি রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটি করে তুলতে। অন্য একটা ছোটো দল আবার চেষ্টা শুরু করেছে তমালকে সাট্টার ঠেকটা চিনিয়ে দিতে। প্রস্তাব যাই আসুক, তমাল তৎক্ষণাৎ তা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছে। এ কাজে ঘ্যানতাড়াও হয়ে গিয়েছিল তার প্রায় মুখস্ত। মায়ের পেনশন, ছাত্র পড়িয়ে আয়— অর্থাভাব হবে কেন? ...তবুও তমাল দিনের মধ্যে একবার অন্তত মায়ের মন্দিরে ঢোকে এবং বেরিয়ে আসতে সময় নেয় অনেকটা। আত্মীয়-স্বজনদের পরামর্শ, তমালকে এবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করো। কী চমৎকার হয়েছে দেখতে। আর মনটাও যেন ঠাকুর-দেবতার পায়ে বন্ধক। অমন আদর্শবান তরুণ দেশের জন্য, দশের জন্য কত কী করতে পারে!

সুযোগ করে দেওয়াটা আমাদেরই কর্তব্য। সুখের সঙ্গে উপার্জনের বিভাজন একটা কথার কথা মাত্র। যে সৎ, পরিশ্রমী, দুর্নীতি ছাড়াই সে উপার্জন করতে সক্ষম; সর্বোপরি, ধর্মে যার মতি... এরকম সন্তানই তো চান বসুমতীর মতো মায়েরা।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে শঙ্খ বেজে ওঠে মন্দিরে, বাড়িতে, বাড়িতে— গোটা গ্রামের মানুষ দেব-দেবীকে নিবেদিত সেই ধ্বনিতে জেগে উঠছেন। এটা অভাবিত নয়, বরং অনিবার্য। আসুন, আমরা আমাদের এই ঐতিহ্যে শামিল হবার চেষ্টা করি। □

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের যোগদান নিশ্চিতভাবেই রাজনীতিতে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবে

তারক সাহা

ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের যোগদান নিশ্চিতভাবেই রাজনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিধাননগরের বিজেপির কার্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের হাত থেকে পতাকা নিয়ে পাকাপাকি ভাবে বিজেপিতে যোগদান করলেন। এর আগে কংগ্রেসের কৌস্তভ বাগচী ও তৃণমূলের বিধায়ক তাপর রায় বিজেপিতে যোগদান করলেন। কৌস্তভ এক তৃণমূল বিরোধী পরিচিত মুখ রাজ্য রাজনীতিতে। অতি সম্প্রতি তাঁর বাড়ি থেকে গভীর রাতে পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায় তাঁর এক কটূক্তির জন্য এবং তার পরের ঘটনা সকলেই জানে। আর এই প্রেক্ষাপটে তিনি এক প্রতিজ্ঞা করে বসলেন মাথা ন্যাড়া করে যে, যতদিন মমতাকে রাজ্যের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে না পারছেন তিনি তাঁর মাথায় চুল গজাতে দেবেন না। এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে এবং ইন্ডি জোটের মধ্য দিয়ে এ রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের নৈকট্য কৌস্তভ ভালো ভাবে মেনে নেননি। বিভিন্ন ফোরামে তাঁর এই বিষয়ে মতামত জানিয়েছেন এবং পার্টি হাইকমান্ডের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েও সুফল মেলেনি বলে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন।

তাপস রায় বহুদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিক। ২০০০ সালে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যান। কিন্তু তিনিও দলীয় কোন্দলের শিকার। তাঁর অভিযোগের তির সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এক সময়ের মমতার প্রিয় এই নেতার অভিযোগ, সুদীপ নাকি ষড়যন্ত্র করে তাঁর বাড়িতে ইডি পাঠিয়ে তাঁর মানহানি করেছেন। শেখ শাজাহানের বাড়িতে ইডির হানা নিয়ে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে শাজাহানের পাশে দাঁড়ালেও তাপসের পাশে দাঁড়াননি মমতা। এই ঘটনায় মর্মাহত তাপস তড়িঘড়ি বিধায়ক পদ ছেড়ে দিয়ে বিজেপিতে এসেছেন।

এই দুটি ঘটনা পরপর ঘটে যায়। কৌস্তভ বা তাপস পুরোপুরি রাজনৈতিক নেতা। এঁদের দলবদল এখন আর তেমন চর্চার বিষয় নয়। ভারতীয় রাজনীতিতে এগুলো হলো আয়ারাম গয়ারামদের রাজনীতি। জনমানসে এর তেমন প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় না।

এরই মাঝে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং রাজনীতিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন গত ৫ মার্চ আর সাত তারিখে দলের পতাকা হাতে নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন। চাকরি দুর্নীতির মামলায় তিনি গত দু' বছর ধরে খবরের শিরোনামে। তাঁর নির্দেশে রাজ্যের শাসক দলের তাবড় নেতা, আমলা, মন্ত্রী-সহ বেশ কয়েকজন জেলে রয়েছে গত দু' বছর ধরে। অনেক চাকরি প্রার্থীদের কাছে তিনি ঈশ্বরের অবতার। এহেন বিচারপতির বিজেপি দলে যোগদান অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না।

না মেনে নিতে পারলেও তাঁর এই সিদ্ধান্ত অনেকক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এরাজ্য গত পাঁচ দশক ধরে ধারাবাহিক ভাবে রাজনীতির অবমূল্যায়ন হয়ে চলেছে তাতে সমাজের শিক্ষিত, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের রাজনীতিমুখো করানো যাচ্ছিল না কিছুতেই। তরুণ প্রজন্ম রাজনীতিতে যোগদানের উৎসাহ হারাচ্ছিল। পরিণামে রাজনীতি যেন এক পঙ্কিল আবর্তে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক দলগুলো যেন ধান্দাবাজ অপরাধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই যোগদান শিক্ষিত, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে উৎসাহ বাড়বে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার।

দ্বিতীয়, সেকু-মাকুদের সমালোচনা যে, বিজেপির মুখ কে এই রাজ্যে? সেই অভাবটা অনেকটা কেটেছে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান করা শুভেন্দু অধিকারীর জন্য। এই প্রথম বিরোধী দলনেতা বলে সংসদীয় গণতন্ত্রে যে একটি পদ আছে তা ভালো ভাবে বুঝতে পারছেন মমতা ব্যানার্জি। দু-দুটো বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে কাউকে সেভাবে দেখেনি রাজ্যের মানুষ। কার্যত প্রায় বিরোধী শূন্যভাবে দুটো বিধানসভা পেরিয়ে গেলেও তৃতীয়বারের মতো বিরোধী দলের ভূমিকা কেমন তা শুভেন্দুবাবু বুঝিয়ে দিচ্ছেন রাজ্য সরকারকে।

এতদিন অনেকেই বলে এসেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির মুখ কে? অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের যোগদানের পর সেই অভাবটা হয়তো পূরণ করা গেল। অনেকেই বলেন বিজেপির সামনে লড়াই করার স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা একশো কিলোমিটারের মধ্যে নেই। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা কেন্দ্রিক নেতা হিসেবে উঠে এসেছেন এবং তাঁর এই উত্থান এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের কপালের চিন্তার ভাঁজ বাড়বে। নির্বাচনী রাজনীতিতে অভিজিৎবাবু নজির স্থাপন করলেন হাইকোর্টের সিটিং জজ থেকে অবসর নিয়ে সরাসরি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে। অতীতে অনেক বিচারপতি রাজনীতিতে এসেছেন অবসর গ্রহণের পর। রঙ্গনাথ মিশ্রকে রাজ্যসভায় এনেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী এবং রঞ্জন গগৈ রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতি মনোনীত সাংসদ হয়েছেন।

অভিজিৎবাবুর বিষয়টি আলাদা। তাঁর রাজনীতিতে যোগদান অবশ্যই এক সঠিক সিদ্ধান্ত। এতদিন বিচারপতি হিসেবে কাজ করেছেন প্রণীত আইনের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। তাঁর রায় সেই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে যায়নি। এবারে তিনি সাংসদ হলে তাঁর ভূমিকা হবে আইন প্রণয়ন করা। সংসদীয় গণতন্ত্রে সাংসদরা হলেন জনজীবনের নিয়ন্ত্রক। সবশেষে বলতে হয় যে, একজন সৎ, পরিশীলিত মানুষ হিসেবে অভিজিৎবাবুর রাজনৈতিক দলে যোগদান নিশ্চিতভাবেই ভালো মানুষ, সমাজের সুচিন্তিত অংশকে রাজনীতিতে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করবে। □

ভারত সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ

সিএএ হলো ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে প্রতিবেশী দেশ ত্যাগ করে ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের পরিচিতি পুনরুদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ। উদ্বাস্তুরা বাঁচার তাগিদে নিজের পরিচিতি বিকৃত করে, ঘুষ দিয়ে, অনেকে ভারতীয় ভোটার কার্ড বানিয়ে নিয়েছে। যারা নিজের জন্মস্থান লুকিয়েছেন, তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে, আইডি কার্ডে নিজের আসল জন্মস্থান যুক্ত করতে পারবে, নিজের পুরানো শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট দিয়ে সরকারি, বেসরকারি কাজের সুযোগ পাবে। বর্তমান ভারত সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উদ্বাস্তুদের আর ভয়ে কাজ ফেলে কোনো পার্টির ঝান্ডা নিয়ে মিছিলে যেতে হবে না। যে উদ্বাস্তুরা ভোটার কার্ড জোগাড় করেছে, তাদেরও ডকুমেন্ট সংশোধন করা উচিত। মানুষ এসএসসি দুর্নীতির কেস থেকে জেনে গেছে যে, দুর্নীতি করে ভোটার কার্ড পেলেও সেটা কিন্তু আইনের চোখে বৈধ নয়। আপনি যদি নকল মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট দিয়ে, নিজের যোগ্যতায় পিএইচডি করে প্রফেসরও হন, আপনার সব সার্টিফিকেট, প্রফেসরের জব অবৈধ ও মূল্যহীন। এটাই আইন।

বৈধ হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করুন। মাথা উঁচু করে আপনি ও আপনার উত্তরপুরুষরা বাঁচুন। যদি নিজেকে বৈধ করতে ভয় পান, তাহলে ভবিষ্যতের কোনো সরকার হঠাৎ আপনাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ঘোষণা করলে, আপনার আর কিছুই করার থাকবে না। যে দেশ থেকে এসেছেন, সেই দেশও আপনাকে ফেরত নেবে না। সরকারের হাত অনেক লম্বা। আজকাল ডেটা সায়েন্স দিয়ে সহজে বৈধ অবৈধ প্রমাণ করা যায়। সরকারি আইনে কোনো বৈধতা পেলে, পরে অন্য কোনো সরকার তা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে না।

—**মৃণাল মজুমদার,**
বার্লিন, জার্মানি।

সিএএ নিয়ে এদেশের মুসলমানদের ভয়ের কোনো কারণ নেই

সিএএ নাগরিকত্ব সংশোধন আইন মানে নাগরিকত্ব প্রদানকারী আইন। এই আইন লাগু হলে তিনটি দেশ— আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে অমুসলমানরা (অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ শিখ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টান) ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত হয়ে এদেশে এলে এদেশের নাগরিকত্ব পাবেন। যাঁরা ২০১৪ সালে ৩১ ডিসেম্বরের আগে চলে এসেছেন, এক বছর ভারতে রয়েছেন, ১৪ বছরে অন্তত পাঁচ বছর এখানে বসবাস করছেন এই আইন বলে তাঁরা আর শরণার্থী হয়ে থাকবেন না। তাঁরা ভারতের সহ নাগরিক হয়ে আমাদের মতো সমমর্যাদা পাবেন। এখানে এনআরসি-র মতো নাগরিকত্ব হারানো নয়। তাই সিএএ এনআরসি নয়। রাজীব গান্ধী এই এনআরসি দিয়ে হিন্দু শরণার্থীদের এ দেশ থেকে তাড়াতে চেয়েছিলেন। এই এনআরসি চেয়েছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখন সিএএ বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশ বিরোধী কার্যকলাপের ফাঁদে আটকে পড়েছেন। সিএএ-র বিরোধী আন্দোলনের নামে ভয়ংকর, পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনায় প্রায় ১০০ জনের মৃত্যু আমাদের মনে তীব্র ভয় উদ্রেক করে।

এ দেশের মুসলমানরা হিন্দুদের মতো ভূমিপুত্র। তাঁদের হারানোর কিছু নেই, তাই ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিন এই দেশের নাগরিক হয়েছেন। ইতালির নাগরিক সোনিয়া গান্ধীও এখন এ দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। এই আইন লাগু না হলে সন্দেশখালির শেখ শাজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারের মতো যে কেউ এসে ক্ষমতার গদিতে বসে মা-বোনের ইজ্জত লুটবে, আমাদের ধ্বংস করবে। ইতিহাসের আলাউদ্দিন খিলজির মতো হিন্দু নিধন শুরু করবে, মা-বোনেদের ধর্ষণ করে খুন করবে আর আমরা অসহায় হয়ে জহরব্রত পালনের নামে আগুনে আহুতি দিয়ে মৃত্যু বরণ করবো। কেউ যদি সেই ঘৃণ্য ইতিহাস দেখতে চান তাহলে বলবো সিএএ-র বিরোধিতা করুন। আগের আইন বলে যে কেউ যখন খুশি এখানে এসে দুর্বল নাগরিকত্ব আইনের সুযোগ নিয়ে সচিত্র পরিচয়পত্রের অধিকারী হতে পারতেন। সোনিয়া গান্ধী হয়তো মনে করলে আইনের ফাঁক গলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। ভগবানের অশেষ কৃপায় ভারতবাসী সেই লজ্জার হাত থেকে বেঁচে গেছে। আগামীদিনে বাংলাদেশের কোনো নাগরিক ওই আইন বলে এখানে এসে পশ্চিমবঙ্গের মাথায় বসে ছড়ি ঘোরাতে পারতেন। কোনো রোহিঙ্গা আমাদের শাসক হয়ে বসলে কেমন লাগবে মনে করুন। বর্তমানের সংশোধিত আইনে খুব সুস্পষ্ট করা আছে। ভুলভ্রান্তির কোনো কারণ নেই। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নাগরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। সিএএ নিয়ে আন্দোলন বিজেপি বিরোধী নেতা-নেত্রীদের নির্বাচনী ওয়ার্ম আপ ছাড়া আর কিছু নয়। একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সিএএ বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশ বিরোধিতা করবেন না। আসুন, আমরা সবাই ভালো থাকি। আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত কারা এদেশের নাগরিকত্ব পাবেন তা ঠিক করুক সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ভুঁড়ি নিয়ে জেরবার

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

এক সময়ে ছিল ছিপছিপে চেহারা, আর এখন ভুঁড়ি নিয়ে জেরবার। খাওয়াদাওয়া নিয়ন্ত্রণেও লাভ হয় না। অথচ ভুঁড়ি হয়, কী করণীয়।

ভুঁড়ি কেন হয়?

শরীরে যতটা ক্যালোরি ঢুকছে, ততটা যদি খরচ না হয় তাহলে মেদ জমতে থাকে। সহজেই মেদ জমে পেটকে কেন্দ্র করে। মূলত সেই মেদ ভিসেরাল (অভ্যন্তরীণ অঙ্গের উপর), সাবকিউটেনিয়াস (ত্বকের নীচে) ও স্টাবর্ন ফ্যাট (ত্বকের উপরে)। এটাই হলো ভুঁড়ি।

ভুঁড়িতে কী সমস্যা

দেখতে খারাপ লাগা তো আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে নানান খারাপ প্রভাব পড়ে। আসলে ভুঁড়ি হলো লাইফ স্টাইল ডিজঅর্ডার। উচ্চ রক্তচাপ, সুগার ও অন্য বিপাকজনিত রোগ ভোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়াও ক্লান্তি, অল্প পরিশ্রমে হাঁফ ধরে যাওয়ার মতো সমস্যাও হতে পারে ভুঁড়ির জন্য।

খাওয়া কমালে কি ভুঁড়ি কমে?

শুধু খাওয়া কমালেই হবে না, বদল আনতে হবে জীবনশৈলীতেও। বর্জন করতে হবে কার্বোহাইড্রেট। বন্ধ করতে হবে মিষ্টি ও ভাজাভুজি খাওয়া। খাদ্যাভ্যাসে বদল এনে কায়িক শ্রম, হাঁটাহাঁটি করে ঘাম ঝরালে ফল মেলে। প্রয়োজনে ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নিতে হবে।

কী খেলে সবচেয়ে কম ক্যালোরি ঢোকে শরীরে

দই-শশা বা রায়তা বা স্যালাডের মতো লো-ক্যালরি খাবার খেতে হবে। এতে অনেকক্ষণ পেট ভরা থাকে। রাতে ঘুমানোর সময় বাদ দিলে ৩/৪ ঘণ্টার বেশি পেট খালি রাখা যাবে না। দরকার পর্যাপ্ত ঘুম ও স্ট্রেস মুক্ত রোজ নামচা।

দিনে মাত্র দুবার খেলে কি ভুঁড়ি বাগে আসে?

একেবারেই না। এটা ভুল ধারণা। বরং হিতে বিপরীত হয়। খালি পেট হলো ভুঁড়ির অন্যতম কারণ। বরং অল্প করে বার বার খেতে হবে। খাওয়ার মাঝে তিন ঘণ্টার ব্যবধান রাখা ভালো। ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চে বেশি করে খেতে হবে; কিন্তু ডিনারে অল্প খাওয়া দরকার। রাতের খাবার খাওয়া ও ঘুমোতে যাবার মধ্যে ১/২ ঘণ্টার গ্যাপ থাকলে ভালো।

কম খেলেও কি ভুঁড়ি হয়?

হতে পারে। তবে কী খাওয়া হচ্ছে সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রান্নায় তেলের ব্যবহার কমাতে হবে। আপেল, পেয়ারা, আঙুর, ছোলা, ওটস, ব্রাউন ব্রেড, ডালিয়া ইত্যাদিও খেতে হবে। এর সঙ্গে প্রচুর জল খেতে হবে। এর সঙ্গে প্রচুর জল পান ও ব্যায়াম করতে হবে তবেই রোগী ভালো থাকবে।

মহিলাদের কি ভুঁড়ি হওয়ার প্রবণতা কম?

এমনিতে মহিলাদের ভুঁড়ি হওয়ার প্রবণতা পুরুষদের চেয়ে অনেকটা কম। কিন্তু সেই ফারাক প্রায়ই গায়েব হয় বিয়ে ও সন্তান প্রসবের পর। এই সময়ে গর্ভধারণের জন্য পেটের পেশি শিথিল হয় গর্ভস্থশিশুর বৃদ্ধির কারণে। প্রসবের পর সেই পেশি আর হঠাৎ করে আগের অবস্থায় ফেরে না। ডাক্তাররা কিছু ব্যায়াম করার ব্যবস্থা দেখিয়ে দেন। তা না মানলে ভুঁড়ি হওয়া খুবই স্বাভাবিক আর এর সঙ্গে কোলেস্টেরল ও থাইরয়েডের সমস্যা আছে কিনা তা দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

ডায়েট চার্ট

- ভাত, রুটি কম করে খেয়ে শাকসবজি ও তরকারি দিয়ে পেট ভরান। ছোটমাছ, চিকেন, ফল খাওয়া ভালো।
- চপ, সিঙ্গাড়া, রোল, লুচি, পরোটা, চিপস বা কোনো ভাজাভুজি চলবে না।
- চিনি, মিষ্টি, পেস্ট্রি, কোল্ড ড্রিংক খাবে না। ব্রাউন ব্রেড চলতে পারে। চলতে পারে অল্প মুড়ি ও চিড়ে ভাজা।
- চিনি ও ময়দা দিয়ে তৈরি বলে বিস্কুট খাওয়া যাবে না।
- মদে প্রচুর ক্যালোরি, তাই মদ্যপান চলবে না। কোনো নেশার দ্রব্যও নেওয়া চলবে না।

নির্বাচিত খাদ্য, ব্যায়াম ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভুঁড়ি কমাতে সাহায্য করে। □

সংস্কার ভারতীর অজুত প্রণাম

বাঙ্গালি বীর রমণী রাণী ভবশঙ্করী দেবী

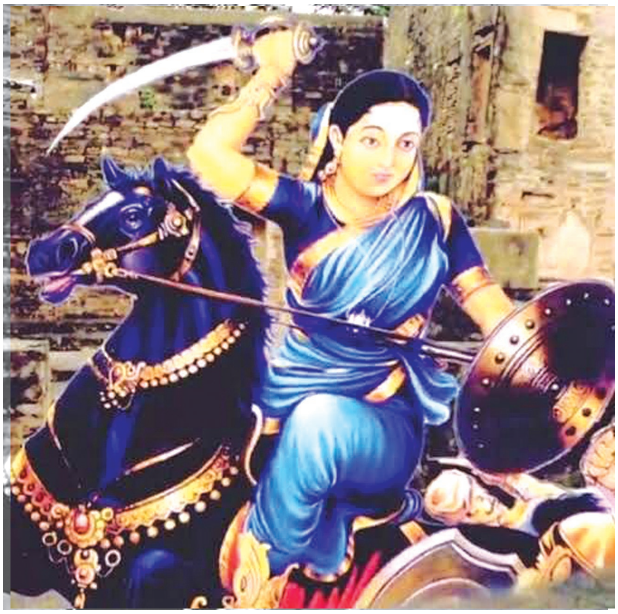

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রানি ভবশঙ্করী দেবীকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করল সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ। কলকাতার সল্টলেক আজাদ ভবন সভাগৃহে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ কলকাতার অধিকর্তা ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ। অনুষ্ঠানের সূচনা লগ্নে দীপমন্ত্র উচ্চারণে পরিবেশ ভাব গম্ভীর হয়ে ওঠে। 'বাংলার মহারাণী ভবশঙ্করী' শীর্ষক আলোচনা বাঙ্গালির ভুলতে বসা ভবশঙ্করী দেবীকে নিয়ে দীর্ঘ চর্চা হয়। যোড়শ শতকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাওড়া, হুগলী ও অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা নিয়ে ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রাজ্য ভুরশুট রাজ্য।

মহারানি ভবশঙ্করী ছিলেন একজন বাঙ্গালি বীর রমণী ও তদনীন্তন ভুরশুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রানি, যাঁর শৌর্য ও বীরত্বের সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল পাঠান সেনাপতি ওসমান খান। পাঠান প্রতিরোধে রানির সাফল্যের কারণে বাদশা আকবর রানির সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে রানি সমীপে মান সিংহকে প্রেরণ করেন এবং রানিকে রায়বাঘিনী উপাধি দেন। পাঠান, আফগান, মুঘলরা বঙ্গের এই মহারানিকে যমের মতো ভয় পেত। রানির আতঙ্কে সুলতানি শাসক, পাঠান শাসকরা পা রাখতে সাহস পেত না বঙ্গে। এমনকী রানি ভবশঙ্করীর শাসনকালে মুঘল শাসক আকবর ভূরিশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। তিনি ভারতের ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের মতো সাহসী ও বীরাঙ্গনা ছিলেন। ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজবংশের কুলদেবী ছিলেন রাজবল্লভী, দেবী চণ্ডীর একটি রূপ এই রাজবল্লভী মাতা। রানি মা-চণ্ডীর উপাসনা করতেন। কথিত, তিনি দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদিষ্ট তরবারি লাভ করেন, যা হাতে থাকলে কোথাও তিনি পরাস্ত হতেন না।

ভবশঙ্করী দেবীর জন্ম ভুরশুট রাজ্যে। এই ভুরশুট রাজ্যের পেঁড়ো দুর্গের সেনাপতি ছিলেন দীননাথ চৌধুরী আর ভবশঙ্করী দেবী ছিলেন দীননাথের কন্যা। খুব অল্প বয়সেই মা মারা যাওয়ায় বাবার কাছে মানুষ হয়েছিলেন ছোট্ট ভবশঙ্করী। খুব অল্প বয়স থেকেই বাবার কাছে ঘোড়া চালানো, অস্ত্র চালানো, তিরন্দাজিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ভবশঙ্করী যখন বড়ো হন, তখন বিবাহ হয় ভুরশুটের রাজা রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে। কিন্তু পুত্র প্রতাপনারায়ণের জন্মের পরেই মারা যান রুদ্রনারায়ণ। তখন ভুরশুট রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সিংহাসনে মহারানি হিসেবে বসেন ভবশঙ্করী দেবী। সেই সময় দেশজুড়ে মুঘল, পাঠান ও আফগানরা লুঠপাঠ চালাচ্ছে, দখল করে নিচ্ছে একটার পর একটা রাজ্য। এদিকে সিংহাসনে বসার পর থেকেই হাওড়া ও হুগলী ছাড়িয়ে বর্ধমান ও মেদিনীপুরেও রাজ্য বিস্তার করে ফেলেন মহারানি ভবশঙ্করী। রানি ভবশঙ্করীর বীরত্ব ও প্রবল বিক্রমের কাছে মুঘল, পাঠান, আফগান শাসকেরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বীরাঙ্গনা মহীয়সী নারী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন বঙ্গের ইতিহাসে পাতায় 'রায়বাঘিনী রানি ভবশঙ্করী' রূপে।

ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ নারী দিবসে বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেন ভারতবর্ষের মহিয়সী আদর্শ নারীদের কথা। রানি লক্ষ্মীবাঈ, রানি রাসমণি, মা সারদার কথা। ভারতবর্ষে আরও একজন মহীয়সী আদর্শ নারী ছিলেন রানি ভবশঙ্করী। অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী গবেষক ড. পূরবী রায়। তাঁর ভাষণে ছিল নারী স্বাধীনতার বার্তা। তিনি বলেন, 'সমাজে সমানাধিকার আনার জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে, হচ্ছে। তাই নিজেদের সম্মান নিজেদের আদায় করে নিতে হবে, ভারতের নারীকে আরও সচেতন হতে হবে, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। যেখানেই নারী, সেখানেই শক্তি। নারী যেখানে নেই সেখানে শক্তির কিছু কম আছে।'

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, 'বাঙ্গালি ভুলে গেছে বাঙ্গালি ললনা বীর রমণী রানি ভবশঙ্করী দেবীকে। নতুন প্রজন্মের কাছে তার বিজয়গাথা তুলে ধরতেই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তাকে স্মরণ করলো সংস্কার ভারতী। সভায় সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের নিবেদন— সংগীত শ্রদ্ধাঞ্জলি— 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' পরিবেশন করেন তনুশ্রী মল্লিক।

কবিতা পাঠ করেন মল্লিকা রায়। 'ভবশঙ্করী দেবী বাঙ্গালি বীর রমণী রানি ভবশঙ্করী দেবী' শীর্ষক ভিডিয়ো ডকুমেন্টারি প্রকাশিত হয়। গবেষণা ও ভিডিয়ো নির্মিত রীনা ব্যানার্জি। পাঠে কোয়েল মালি নস্কর। পরিকল্পনা ও রূপায়ণ— তিলক সেনগুপ্ত। □

সুখবীর সান্ধু, জ্ঞানেশ কুমার হলেন নবনিযুক্ত কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১৪ মার্চ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনার পদে স্থলাভিষিক্ত হলেন সুখবীর সান্ধু ও জ্ঞানেশ কুমার। আইনানুগ প্রক্রিয়ায় এই দু'জন আমলাকে নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করেছে তিন সদস্যবিশিষ্ট সিলেকশন কমিটি। গত ফেব্রুয়ারিতে অনুপ কুমার পাণ্ডের অবসরগ্রহণ এবং গত ৯ মার্চ অরুণ গোয়েলের পদত্যাগের পর দু'জন নির্বাচন কমিশনারের পদ শূন্য হয়। তিন সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে একমাত্র রয়ে যান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার।

সুখবীর সান্ধু

জ্ঞানেশ কুমার

প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী মনোনীত একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা বা লোকসভার একক বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতার সমন্বয়ে গঠিত একটি সিলেকশন কমিটি নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করে থাকে। এই দু'জন নির্বাচন কমিশনারের নিযুক্তির পর বর্তমানে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-সহ তিন সদস্যের ফুল বেঞ্চের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

গত ১৬ মার্চ বেলা ৩টায় নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে প্লেনারি হলে আয়োজিত একটি প্রেস কনফারেন্সে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন লোকসভার সাধারণ নির্বাচন, ২০২৪-এর নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন। দেশ জুড়ে সাত দফায় অনুষ্ঠিত হতে চলা এই সাধারণ নির্বাচন শুরু হবে আগামী ১৯ এপ্রিল এবং শেষ হবে আগামী ১ জুন। ভোটগণনা হবে আগামী ৪ জুন। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৯৭ কোটি, পোলিং স্টেশন বা ভোটদান কেন্দ্র ১০.৫ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে ভোটগ্রহণ হবে ৭ দফায়।

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের সূচি

- **প্রথম দফা :** ১৯ এপ্রিল – কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি
- **দ্বিতীয় দফা :** ২৬ এপ্রিল — দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট
- **তৃতীয় দফা :** ৭ মে — মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ
- **চতুর্থ দফা :** ১৩ মে — বহরমপুর, বোলপুর, বীরভূম, কৃষ্ণনগর, আসানসোল, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর, রাণাঘাট
- **পঞ্চম দফা :** ২০ মে — বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হুগলি, শ্রীরামপুর, আরামবাগ, উলুবেড়িয়া, হাওড়া
- **ষষ্ঠ দফা :** ২৫ মে — পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ঝাড়গ্রাম, তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, মেদিনীপুর
- **সপ্তম দফা :** ১ জুন — ডায়মন্ড হারবার, বসিরহাট, জয়নগর, দমদম, বারাসত, কলকাতা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তর, মথুরাপুর, যাদবপুর।

ব্যাঙ্গালোরে হনুমান চালিশা শোনার কারণে প্রহৃত ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১৭ মার্চ ব্যাঙ্গালোরের সিদ্দান্না লে-আউটে আজানের সময় হনুমান চালিশা শোনার জন্য আক্রান্ত হলেন একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী। সামাজিক মাধ্যমে (সোশাল মিডিয়ায়) ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে কয়েক জন জেহাদি ওই ব্যবসায়ীকে বেদম প্রহার করছে দেখা যায়। তাদের প্রহারের ফলে ওই ব্যবসায়ী শারীরিকভাবে আহত হন। এই ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে আলোড়ন ওঠে। ব্যাঙ্গালোর পুলিশ হালাসুরু গেট পুলিশ লিমিট থানায় একটি এফআইআর রুজু করেছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে। ব্যবসায়ী বলেন যে তিনি তাঁর দোকানে শ্রীহনুমানের ভজন শুনছিলেন। এইসময় ৪-৫ জন জেহাদি মানসিকতার লোক তার দোকানে এসে বলে যে এটা আজানের সময়। এই সময় এই ভজন শুনলে তাকে পেটানো হবে। ছুরি দিয়ে তাঁকে আঘাত করার হুমকিও তারা দেয়। এই নিয়ে বাদানুবাদের পরেই তারা তাঁকে মারধোর শুরু করে। ব্যবসায়ীর বাবা গোপাল সিংহ সংবাদমাধ্যমকে জানান যে ঘটনার সময় তিনি দোকানে ছিলেন না। তাঁর ছেলে দোকানে ভক্তিমূলক গান শুনছিলেন। গানের সাউন্ড কম থাকলেও ওরা ওকে মারধোরের উদ্দেশ্যেই দোকানে আসে এবং ওর ওপরে সরাসরি হামলা চালায়। আমারা ন্যায়বিচার প্রার্থনা করি।

কর্ণাটক বিধানসভায় 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান থেকে শুরু করে ব্যাঙ্গালোরের রামেশ্বরম কাফেতে বোমা বিস্ফোরণ। আর তার পরেই হিন্দু ব্যবসায়ীকে তার দোকানে এসে আক্রমণ এবং শারীরিক নিগ্রহ।

প্রশ্ন উঠেছে, কর্ণাটকে কি হনুমান চালিশা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কংগ্রেস সরকার? কর্ণাটকের কংগ্রেসি সরকারের নির্লজ্জ তোষণ নীতির কারণে কর্ণাটক জুড়ে একের পর এক জঘন্য ঘটনা, জেহাদি আক্রমণ ঘটেই চলেছে। জেহাদিদের এই বাড়বাড়ন্ত থামার কোনো লক্ষণ নেই।

জলদস্যুরা জব্দ ভারতের হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতীয় নৌসেনার মুকুটে নয়া পালক। মাঝ সমুদ্রে সোমালিয়ার জলদস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে উদ্ধার করল অপহৃত জাহাজ। ৪০ ঘণ্টা ধরে অভিযান চালায় আইএনএস কলকাতা। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় ৩৫ জন জলদস্যু। ভারতীয় নৌসেনার পক্ষে আরব সাগরে মোতায়েন মিশন, আইএনএস কলকাতা— সোমালি জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত 'এমভি রুয়েন' নামক জাহাজটিকে চিহ্নিত করে এবং জাহাজটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে গত ১৬ মার্চ জাহাজটিকে আটক করতে সক্ষম হয়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এই পণ্যবাহী বাণিজ্য তরীটিকে হাইজ্যাক করে নিজেদের কবজায় নেয় সোমালি জলদস্যুরা। ভারতীয় নৌসেনার মেরিটাইম সিকিউরিটি অপারেশনসের অন্তর্গত দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নজরদারি এবং বিভিন্ন জাহাজ পরিবহণের উপর পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির দ্বারা সংগৃহীত নজরদারি তথ্য বিশ্লেষণ করে এমভি রুয়েনের গতিবিধি ট্র্যাক করতে সমর্থ হয় নৌবাহিনী এবং সোমালিয়ার ২৬০ নটিকাল মাইল পূর্বে এমভি রুয়েনের উপস্থিতি গত ১৫ মার্চ চিহ্নিত করে আইএনএস কলকাতা। ড্রোনের মাধ্যমে এমভি রুয়েন জাহাজে সশস্ত্র জলদস্যুদের উপস্থিতির প্রমাণও পাওয়া যায়। ড্রোনটিকে জলদস্যুরা গুলি করে এবং ভারতীয় রণতরী আইএনএস কলকাতাকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করে। এরপর আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সমুচিত জবাব দিয়ে এমভি রুয়েনের স্টিয়ারিং সিস্টেম ও নেভিগেশনাল এইডসকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে জাহাজটিকে থামতে বাধ্য করে আইএনএস কলকাতা। ভারতীয় ভূখণ্ড হতে ২৬০০ কিলোমিটার বা ১৪০০ নটিকাল মাইল দূরত্বে ভারতীয় নৌসেনার এই অ্যান্টি-পাইরেসি (জলদস্যু দমন) অপারেশনে আইএনএস কলকাতার সহায়তায় ১৬ মার্চ আইএনএস সুভদ্রাকে মোতায়েন করে নৌবাহিনী। এর সঙ্গে সি-১৭ যুদ্ধবিমান থেকে 'প্রহার' মেরিন কম্যান্ডোদের এয়ার ড্রপিং করা হয়। HALE RPA (হাই অল্টিটিউড লং এন্ডিয়োরেন্স - রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্র্যাফট্ সিস্টেম)-এর মতো ইউএভি বা চালকহীন বিমান এবং পি-৮১ মেরিটাইম রেকনেসেন্স এয়ারক্র্যাফট্ থেকে জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত জাহাজ এমভি রুয়েনের ওপর ক্রমাগত নজরদারি চলতে থাকে। তীব্র অপারেশনের শেষে ৩৫ জন জলদস্যু আত্মসমর্পণ করে এবং জাহাজের ১৭ জন ক্রু মেম্বার বা নাবিককে উদ্ধার করা হয়।

বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও নিষিদ্ধ পণ্য মজুত থাকার কারণে জাহাজটিকে স্যানিটাইজড্ করা হয়। গত ১৭ মার্চ জাহাজটির সমুদ্রে বিচরণ ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয় এবং আনুমানিক ১ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ৩৭,৮০০ টন পণ্য বহনকারী এই জাহাজটিকে নিরাপদে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। জলদস্যু দমনের লক্ষ্যে ভারতীয় নৌসেনার এই সফল অ্যান্টি-পাইরেসি অপারেশন দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভারতীয় নৌবাহিনীর সংকল্পের প্রমাণ। যে কোনো বিষয়ে ভূমিকা পালনকারী ভারতীয় নৌসেনা আজ এই অঞ্চলে 'ফার্স্ট রেসপন্ডার'।